মুনতাসীর মামুন
জয় বাংলা

'দ্বীপ-দ্বীপান্তর'-'লড়াই'-এর মতো ক্লাসিক কিশোর উপন্যাসের রচয়িতা মুনতাসীর মামুন একযুগ পর ফের ফিরে এলেন কিশোর সাহিত্যে, কিশোর- তরুণদের জন্য প্রথম রাজনৈতিক উপন্যাস 'জয় বাংলা' নিয়ে।

সরল ও সাবলীল ভাষায় এবং অনন্য কুশলতায় রচিত বইটির মাধ্যমে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের নতুন ও তরুণ প্রজন্মদের জানতে ও বুঝতে সাহায্য করবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ভিত্তি। এছাড়া পুরনো জেনারেশনদের অনেককে করবে নস্টালজিক।

বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত।

ISBN 984 70297 0006 8

১৯৬৯-১৯৭১ সাল বাংলাদেশের ইতিহাসে মাইলফলক শুধু নয়, ঐ বছরগুলি ছিল বাঙালী তরুণ-তরুণীদের। আর সেই সব কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীদের নিয়ে রচিত এই উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে ১৯৬৯-১৯৭১ এর ঝড়ো দিনগুলো।

তরুণ-তরুণী ও আপামর বাঙালিদের কাছে অসংখ্য শ্লোগানের মাঝে তখন 'জয় বাংলা' শ্লোগানটি হয়ে উঠেছে অত্যন্ত প্রিয়, ছড়িয়ে পড়েছে পথে প্রান্তরে— যার মধ্যে লুকিয়ে ছিলো অদম্য শক্তি। সব রকম সংগ্রামে 'জয়বাংলা' তখন এদেশবাসীকে যুগিয়েছে বাঙালির নিজ ভূখন্ড জয়ের বাসনা ও অফুরান প্রেরণা।

'দ্বীপ-দ্বীপান্তর'-'লড়াই'-এর মতো ক্লাসিক কিশোর উপন্যাসের রচয়িতা মুনতাসীর মামুন একযুগ পর ফের ফিরে এলেন কিশোর সাহিত্যে, কিশোর-তরুণদের জন্য প্রথম রাজনৈতিক উপন্যাস 'জয় বাংলা' নিয়ে। সরল ও সাবলীল ভাষায় এবং অনন্য কুশলতায় রচিত বইটির মাধ্যমে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের নতুন ও তরুণ প্রজন্মদের জানতে ও বুঝতে সাহায্য করবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ভিত্তি। এছাড়া পুরনো জেনারেশনদের অনেককে করবে নস্টালজিক।

বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ হাশেম খান

ছবি : এম. এ. তাহের

মুনতাসীর মামুনের জন্ম ১৯৫১ সালে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে এম.এ, পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছেন। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক। লেখালেখি করছেন ১৯৬৩ সাল থেকে। ছাত্রজীবনে জড়িত ছিলেন ছাত্র-আন্দোলনে এবং ১৯৬৯ সাল থেকে এ-পর্যন্ত অংশগ্রহণ করেছেন প্রতিটি সাংস্কৃতিক ও গণআন্দোলনে। স্বাধীন বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত প্রথম ডাকসু নির্বাচনে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন সম্পাদক। একই সময়ে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি সংসদের সভাপতি। তাঁর সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয় ডাকসু'র মুখপত্র 'ছাত্রবার্তা'। এছাড়াও বাংলাদেশ লেখক শিবির ও বাংলাদেশ লেখক ইউনিয়নের ছিলেন তিনি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও যথাক্রমে প্রথম যুগ্ম আহ্বায়ক ও যুগ্ম সম্পাদক। ঢাকা নগর জাদুঘরের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বঙ্গবন্ধু জাদুঘরের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন তিনিও একজন। এছাড়াও তিনি জড়িত বিভিন্ন একাডেমিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। বাংলাদেশে লেখালেখির জগতে মুনতাসীর মামুন একটি বিশিষ্ট নাম। সমসাময়িককালে তাঁর মতো পাঠক নন্দিত লেখক খুব কমই আছে। গল্প, কিশোরসাহিত্য, প্রবন্ধ, গবেষণা, চিত্রসমালোচনা, অনুবাদ ইত্যাদিতে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ ও সেই সাথে রাজনৈতিক ভাষ্যে অর্জন করেছেন বিশেষ খ্যাতি। উল্লিখিত প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২০০। বাংলা একাডেমী পুরস্কার, লেখক শিবির পুরস্কার, অগ্রণী ব্যাংক পুরস্কার, ড. হিলালী স্বর্ণপদক পুরস্কার, প্রেসিডেন্ট পুরস্কার (১৯৬৩), মার্কেন্টাইল ব্যাংক স্বর্ণপদক, অলক্ত স্বর্ণপদক ইত্যাদিতে তিনি সম্মানিত।

স্ত্রী ফাতেমা মামুন একজন অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকার।

মুনতাসীর মামুন

জয় বাংলা

মুনতাসীর মামুন

জয় বাংলা

ড্রইং : হাশেম খান

মঈনুল আহসান সাবের
প্রীতিভাজনেষু

শিশু কিশোরদের শেষ উপন্যাস লিখেছি তাও প্রায় দু'দশক হয়ে গেলো। এরপর গবেষণা ও অন্যান্য লেখায় জড়িয়ে পড়ি, যদিও সবসময় ভেবেছি আবার শিশু কিশোরদের জন্য লেখায় ফিরে আসি। কারণ আমার লেখক জীবনের শুরুই শিশু কিশোরদের জন্য গল্প উপন্যাস লিখে।

আমার বন্ধু ও আমার ইতিহাস গ্রন্থের প্রথম প্রকাশক আহমেদ মাহফুজুল হক কিন্তু আমাকে সব সময় অনুরোধ করেছেন কিশোরদের জন্য আবার উপন্যাস লেখার। সময় করতে পারি নি। গত ঈদে অনুজ প্রতিম *সাপ্তাহিক ২০০০*-এর সম্পাদক মঈনুল আহসান সাবের জানালেন তিনি সাপ্তাহিকটির ঈদ সংখ্যার সঙ্গে আলাদাভাবে একটি শিশু কিশোর সংকলন করবেন। এবং আমি যেনো তাঁকে একটি উপন্যাস লিখে দিই। কী মনে করে লিখতে বসে গেলাম। অনেক দিন ধরে আমাদের শেকড় খোঁজা নিয়ে একটা কিছু লেখার ইচ্ছে ছিলো। লিখে ফেললাম,

কিন্তু যেমনটি ভেবেছিলাম তেমনটি হয় নি। সাবের উপন্যাসটি বড় হয়ে যাওয়ায় ছাপাতে পারেন নি। বন্ধু মাহফুজুল হক সিদ্ধান্ত নিলেন তিনিই ছাপাবেন উপন্যাসটি।

আমি এবং আমার বন্ধুরা [ও আমাদের পরের লেখকরা] কিশোরদের জন্য লিখতে গিয়ে সাধারণত অ্যাডভেঞ্চার বা বৈজ্ঞানিক কল্প কাহিনিকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। আমি সেরকমটি করি নি। আমি বরং আমাদের গৌরবোজ্জ্বল সময়ের কাহিনি শোনাতে চেয়েছি যার কথা এখন অনেকের মনে পড়ে না। এবং উপন্যাসটি আমাদের কিশোর ও তরুণ পাঠকদের বা বলা যেতে পারে তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশে লেখা। সফল হয়েছি কিনা জানি না। আমি চেয়েছি শুধু আমাদের হারিয়ে যাওয়া সময়টাকে ধরতে।

বই নকশা, প্রচ্ছদ, অলংকরণ ইত্যাদি শিল্পী হাশেম খানের করা যিনি আমার প্রথম দু'টি বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন চারদশক আগে। উল্লিখিত সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২০০৯

মুনতাসীর মামুন

অ

'এই যে কবি সাহেব, এই ভরদুপুরে কোথায় যাচ্ছেন ?' টেনে টেনে বেশ সুরেলা স্বরে জিজ্ঞেস করে দোলা।

কামাল তখন অনিলকে নিয়ে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে, এক তলার ল্যান্ডিং পেরিয়ে সামনের ইট বিছানো রাস্তায় নেমেছে। এমন সময় সুরেলা গলায় এই প্রশ্ন।

থমকে দাঁড়ালো কামাল। অনিলও। একতলার বারান্দায় গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে আছে দোলা। চুল উশকো খুশকো, হাতে মোটাসোটা এক বই, মুখ বেশ গম্ভীর। ঠিক সে মুহূর্তে জুৎসুই কোনও জবাব মুখে আসছে না। গম্ভীরভাবে কামাল বললো, 'আমার বন্ধু অনিল'।

'অনিল দা' যেন বহুদিনের চেনা, এমন ভঙ্গিতে বললো দোলা, 'আপনিও কবি নাকি ?'

অনিল হাসিমুখে এগিয়ে গেলো গ্রিলের সামনে।

'আরে না,' অনিল হাসিমুখে এগিয়ে গেলো গ্রিলের সামনে। 'তবে, এক-আধটু লেখার মকশো করি আর কী! তবে কবিতা নয়।'

'বাঁচা গেলো, আমাদের কবি সাহেবের অন্য বন্ধুদের তো দেখেননি, দেখেছেন ?' হাসিতে মুখ ভরিয়ে বললো দোলা, 'যেমন পোশাক-আশাক তেমনি ভাবসাব। অবশ্য আমাদের কবি সাহেব সে তুলনায় একটু ফিটফাট।' একনাগাড়ে বলতে লাগলো দোলা, 'খবরদার অনিলদা কবিতাটবিতা যদি রবীন্দ্রনাথের মতো ট্রাই করতে না পারেন তাহলে বাদ দেন। আমাদের কবি সাহেবের কবিতা যদি পড়তেন...' বলে হিহি করে হেসে ফেলে দোলা। অনিলও হাসে।

কামালের রাগ চড়তে থাকে। প্রথমে কবি সাহেব বলে ঠাট্টা করা, শুধু তাই নয় তার কবিতা নিয়ে ঠাট্টা, তারপর অনিলকে এতো খাতির করা, যার সঙ্গে আলাপ হয়েছে মাত্র। এবং অনিলটাও সমানে তাল দিয়ে হাসছে। 'অনিল তাড়াতাড়ি আয়, দেরি হয়ে যাচ্ছে ...' বলে, তারপর কী ভেবে যেন কামালও এগিয়ে যায় একতলার বারান্দার গ্রিলের দিকে। ভালো মানুষের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে দোলা। চিবিয়ে চিবিয়ে বললো কামাল, 'বেগম জহরত আরা, নামটা জহরতময় বটে কিন্তু কথা আর চেহারার সঙ্গে তো নামের কোনও মিল দেখি না। চাচা নাম রাখার সময় বোধহয় সেটা ভাবেননি।'

বলেই কামালের মনে হলো, চেহারা নিয়ে কথা বলাটা ঠিক হয়নি। কথাটা যে ফিরিয়ে নেবে তারও উপায় নেই। অনিলও কামালের রাগ দেখে অবাক হয়ে গেছে। দোলার মুখে একটা ছায়া পড়লো মুহূর্তের জন্য, তারপরই হেসে ফেললো, বললো, 'ছি, কবিদের এভাবে বলতে নেই। তাহলে কবি আর কবি থাকে না।' কথা শেষ করে কোনও দিকে না তাকিয়ে ঘরের দিকে হাঁটা শুরু করে দোলা।

'চল,' বললো কামাল। ইট বাঁধানো রাস্তার শেষে লোহার গেট। একপাশে বড়সড় একটা কামিনী গাছ। গেট খুলে দুজনে রাস্তায় নামলো।

'এভাবে না বললেই হতো,' বললো অনিল, 'আমুদে মেয়ে ঠাট্টা করছিলো।'

কামাল কোনও জবাব না দিয়ে হাঁটতে থাকে। দুমিনিট হাঁটলে আরেকটা সরু গলি, তারপর সদর রাস্তা।

'মেয়েটা কে রে?' অনিল আবার জিজ্ঞেস করে।

'প্রতিবেশী,' কামালের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

'হেঁটে যাবি, না রিকশা নিবি', জিজ্ঞেস করে অনিল।

'হেঁটেই চল। ওই তো বায়তুল মোকাররম পেরুলেই পল্টন। তিনটার মিটিং কি আর তিনটায় শুরু হয়।'

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ। সন-তারিখের নির্দিষ্ট হিসাব ধরলে ১৯৬৮ সালের ৬ ডিসেম্বর। বিকেলের শীত শীত ভাবটা বেশ আরামের। রোদের অল্প তাপ, আবার শীত শীত ভাব, সোয়েটার লাগে না। হাঁটতে বেশ ভালো লাগে। পল্টনে মওলানা ভাসানী মিটিং ডেকেছেন। জুলুমবিরোধী দিবস। গত দশ বছর আইয়ুবি শাসনে মানুষজন অতিষ্ঠ। তারা এখন আড়মোড়া ভেঙেছে। আর আইয়ুব খান ঘোষণা করেছেন উন্নয়ন দশক। রেডিও খুললে

এক দশকে আইয়ুব খান কী করেছেন তার ফিরিস্তি। অন্যদিকে তার প্রিয় পুত্র বলে এক সময় খ্যাত জুলফিকার আলি ভুট্টোকেও অ্যারেস্ট করেছেন। লাহোরে এক মিছিলে গুলি চলেছে। ঢাকায় শহীদুল্লাহ কায়সারের নেতৃত্বে সাংবাদিকরা মিছিল করেছেন। এমনকি আইয়ুব অনুগত কয়েকটি দল আগের দিন আল্লাহর কাছে মোনাজাত দিবস পালন করেছেন। ভাসানী ঠিক এক মাস আগে পল্টনে এ রকম আরেকটি মিটিং করেছে। সেই থেকে মানুষজন অস্থির।

ছোটখাটো মিছিল স্লোগান দিয়ে এগুচ্ছে পল্টনের দিকে। দু-একটি মিছিলে ব্যানারও আছে। বেবিট্যাক্সির চালকরাও বেশ লম্বা এক মিছিল নিয়ে এগুচ্ছে, গতকাল তারা ধর্মঘট ডেকেছিলো। মিছিল ছাড়াও লোকজন যাচ্ছে পল্টনের দিকে।

অনিল থাকে জগন্নাথ হলে। কামাল পুরানা পল্টনে। অনিল ছাত্র ভালো। লেখেটেখে আবার ছাত্র মিছিলেও থাকে। ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়া গ্রুপের সঙ্গে জড়িত। সংস্কৃতি সংসদেরও পান্ডাবিশেষ। কামালও লেখেটেখে, বিশেষ করে কবিতা, ছাত্র মিছিলেও যায় সে মাঝে-মাঝে। তবে ছাত্রলীগ বা ছাত্র ইউনিয়ন কোনোটির সঙ্গে জড়িত নয়। দু'জনই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেকেন্ড ইয়ারে, অনিল বাংলায়, কামাল রাষ্ট্রবিজ্ঞানে।

গত বছর কামালরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় তখন এ রকম অবস্থা ছিলো না। সৈয়দপুর থেকে সে এসেছিলো ঢাকায় ভর্তি হতে। কামালের আব্বা আবদুর রহিম বলেছিলেন, রাজশাহীতে ভর্তি হতে। কামাল গোঁ ধরলো। ঢাকাতেই পড়বে। রহিম সাহেব চেয়েছিলেন তার ছোটবোন, বোনের জামাই থাকে রাজশাহীতে। একমাত্র ছেলে কামাল ফুপুর বাড়িতে আদরেই থাকবে, নজরেও থাকবে। তিনিও নিশ্চিন্ত থাকবেন। ঢাকায় তার জানাশোনা কেউ নেই।

কামাল সাহস করে পাড়ি দিলো ঢাকা। সঙ্গে ছিলো আরেক বন্ধু ফেরদৌস। বিজ্ঞানের ছাত্র। ফেরদৌসের এক খালা থাকেন ঢাকায়। দুজন এসে সেখানেই ওঠে। ফেরদৌসের ফিজিক্সে আর কামালের পলিটিক্যাল সায়েন্সে ভর্তি হতে খুব একটা সমস্যা হয়নি। দু'জনই সিট পেয়েছিলো এসএম হলে। গত বছরটা ভালোই গেছে। ঝুট-ঝামেলা তেমন হয়নি। বন্ধু-বান্ধব হয়েছে অনেক। তার মতো যারা এক-আধটু লেখালেখি করে তাদের একটা গ্রুপও তৈরি হয়েছে। মাসে দুবার তারা কারও না কারও

বাসায় বসে, নিজেদের লেখা পড়ে, আলোচনা করে। প্রত্যেকেই ভাবে এক সময় না এক সময় বাংলা সাহিত্যের তারা দিকপাল হবে।

এ বছরের মাঝামাঝি আবদুর রহিম ও তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু জহুরুল হক, সেই সুবাদে কামালের হক চাচা, বদলি হয়েছেন ঢাকায়। প্রথমে জহুরুল হক। তারপর আবদুর রহিম। পুরনো বাসা ছেড়ে দিয়েছেন জহুরুল হক। দু'বন্ধু পুরানা পল্টনের ভেতরের দিকে বাসা নিয়েছেন। দোতলা ছোট বাড়ি। সামনে ছোট একটু লন, নাকি উঠোন। একপাশে একটা আমগাছ, তার ছায়া থাকে সব সময় উঠোনে। হক চাচারা থাকেন নিচে, কামালরা ওপরে। হক চাচা-চাচীর একমাত্র মেয়ে দোলা।

'এই যে কাদের, কাদের' আচমকা ডেকে ওঠে অনিল। রিকশায় যাচ্ছিলো কাদের, সঙ্গে আরেকজন। মুখচেনা, নাম জানা নেই। তাদের দেখে ভাড়া মিটিয়ে কাদের নেমে এলো' বন্ধুসহ। পরিচয় করিয়ে দিলো, 'আমার বন্ধু জাহিদ, ইতিহাসে পড়ে।' সবাই মিলে এগোলো। বায়তুল মোকাররমের কাছাকাছি এসেছে। কিছু মুসল্লি নামাজ পড়ার জন্য মসজিদের দিকে হাঁটছেন।

'কাদের তুই তো মুজিব পার্টি ছাত্রলীগের, মওলানা সাহেবের মিটিংয়ে যাচ্ছিস কী মনে করে ?'

'তুই তো কোনও পার্টি নয়, তুই যাচ্ছিস কী মনে করে ?' কাদের জিজ্ঞেস করে।

'কৌতূহল, শুধু তাই নয়, তুই বোধহয় ভুলে গেছিস', সিনা টান করে আকর্ণ হাসি হেসে কামাল বলে, 'আমি দৈনিক আজাদের বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার।' তাদের বন্ধুদের মধ্যে কামালই নবিশ সাংবাদিক। এতে কামাল বেশ গর্ব বোধ করে। পয়সা-কড়ি না থাক, সাংবাদিক শুনলে সবাই বেশ খাতির করে।

'ভালো বলেছিস,' কাদের বলে, 'আমি রাজনীতি করি, অন্য নেতারা কী বলেন জানা দরকার, আর মওলানা সাহেব তো এক সময় আমাদেরই লোক ছিলেন।'

'লোক কেমন হবেরে কাদের ?' জিজ্ঞেস করে জাহিদ।

'জানি না, মওলানা সাহেব যেহেতু লোক কিছু হবে। যে গরম গরম বক্তৃতা দিচ্ছেন।'

আ

বাদামঅলা দেখে থামল সবাই। অনিল দু'আনার, কামাল দু'আনার বাদাম কিনল। চারজনে ভাগ করে নিল। বাদাম খেতে খেতে তারা স্টেডিয়ামের কাছে পৌঁছে। মিছিলের উত্তেজনা মনে লাগে কামালের। মওলানা সাহেবের জুলুম প্রতিরোধ দিবস। কামাল রাজনীতির অত মারপ্যাঁচ বোঝে না। কিন্তু চারদিকে যা ঘটছে তা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্রটি দূরে থাকতে পারছে। 'ভাসানী ঠিকই করেছেন জুলুম প্রতিরোধ দিবসের ডাক দিয়ে,' বলে কাদের, 'পশ্চিমাদের এই জুলুম আর কতদিন মানা যায় ?'

'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কথা ধর।' বলে অনিল, 'কোথায় আগরতলা আর কোথায় ঢাকা, শেখ সাহেবকে দমানোর জন্যই এতো সব মামলা-মোকদ্দমা। মামলার কথা যখন সরকার ঘোষণা করে তখন তো শেখ সাহেবের নাম ছিলো না।'

'আসলে দুই বছর আগে শেখ মুজিব ছয়দফা ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সেই থেকেই শালা আইয়ুবের জুলুম বাড়ছে', বলে কাদের।

'আরে যা, প্রেসিডেন্টের বোনকে তুই বিয়ে করলি কবে ?' জিজ্ঞেস করে কামাল। সবাই হো হো করে হেসে ওঠে।

আইয়ুব খান দশ বছর গদিতে আছেন পাকিস্তানের। ঢাকায় ভালো এক শিষ্য পেয়েছেন, পূর্ব পাকিস্তানের বটতলার উকিল আবদুল মোনেম খান। কথায় কথায় যিনি আইয়ুব খানের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'মাই প্রেসিডেন্ট'। কামাল বললো, 'আইয়ুবের আমলে তো রাস্তাঘাট হয়েছে, সেকেন্ড ক্যাপিটাল হলো। উন্নয়নের এক দশক নিয়ে তোরা যাই বলিস না ক্যান, উন্নতি তো কিছুটা হলেও হয়েছে।'

'উন্নতিই যদি হয়,' বললো জাহিদ, 'তাহলে সব রাজনৈতিক নেতা জেলে কেন ? ভাসানী ছাড়া সব বড় নেতাই তো জেলে।'

'কামাল, তুই কেন, ঢাকার অনেকেই বলে আইয়ুবের আমলে উন্নতি হয়েছে,' বলে কাদের, 'কিন্তু সাধারণ মানুষের অবস্থা কি খুব ভালো হয়েছে ? বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে কি আমরা চাকরি পাবো ? তুই না হয় সাংবাদিকতায় থাকবি, আমরা মফস্বল কলেজে মাস্টারি বা ছোটখাটো চাকরি হয়তো পাবো। তোর বাবার কথাই ধর না। এমএ পাস কী চাকরি করেন রেলে ? তার বস তো বিএ পাস। প্রমোশন পেয়েছেন গত দশ বছর ?

তুই-ই তো বলেছিস তোর বাবার বস দশ বছরে দুটা প্রমোশন পেয়েছে অবাঙালি বলে।'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কামাল। কথাটা ভুল বলেনি কাদের। এমএ পাস করার পর অনেক চেষ্টা-তদবির করে রেলওয়ের ছোটখাটো অফিসারের পদ পেয়েছেন। ছোট পদে থাকতে থাকতে আরও যেন ছা-পোষা হয়ে গেছেন।

'এনএসএফ কী করছে,' বললো অনিল রাগের সঙ্গে, 'হলে তো তুই আর থাকিস না কামাল, তুই বুঝবি না, কয়েকদিন আগে মুহসীন হলে গেছি, এনএসএফের এক ছোট পান্ডা আমার ঘাড় ধরে বললো, 'মালাউনের বাচ্চা আর কয়দিন থাকবি পাকিস্তানে। পাকিস্তান তো শেষ করে দিলি, ইন্ডিয়ায় যা।'

অনিল কথা শেষ করতে পারলো না। কামাল, কাদের, জাহিদ খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে গেলো। অনিল হিন্দু না মুসলমান তা নিয়ে তাদের কোনও মাথাব্যথা নেই, সে নিয়ে ভাবেওনি কোনোদিন। কিন্তু এখন মনে হলো, তাদের হিন্দু বন্ধুরা কী ক্ষোভ পুষে রেখেছে বুকে। অনিলের বাড়ি বিক্রমপুর। তার বাপ-দাদারা দু'তিনশ বছর ধরে আছেন সেখানে। তাদের কেন যেতে হবে ইন্ডিয়া ? হিন্দু হওয়ার কারণে ? আসলে, ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পরই হিন্দু-মুসলমান প্রভেদটা আঙুল দিয়ে সরকার দেখিয়ে দিচ্ছে। হিন্দুরা শত্রু। তারা ভারতের দালাল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু, তার গান গাওয়া যাবে না, পহেলা বৈশাখ পালন করা যাবে না, ওইটা হিন্দুয়ানি। কামাল হাত রাখলো অনিলের কাঁধে। বললো, 'ভুলে যা অনিল, সময় এলেই শোধ নেব আমরা।' আমার বাবা-মাও তো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন, পহেলা বৈশাখে মাঝে মাঝে ভালো রান্না-বান্না করে দাওয়াত দেন। তাতে কি আমরা হিন্দু হয়ে গেলাম ? ভাবে কামাল।

স্টেডিয়ামের পাশে খোলা জায়গা। বলা হয় পল্টনের মাঠ। লোকজন কম হয়নি। স্লোগান, মানুষজনের কথাবার্তা, উত্তেজিত স্বরে জায়গাটা গমগম করছে।

'কামাল' কামাল' উচ্চকণ্ঠে ফ্যাসফ্যাসে স্বরে কে যেন ডাকছেন। কামাল চারপাশে তাকিয়ে দেখলো, সামনে ডান পাশ থেকে তার নাম ধরে ডাকছেন ফয়েজ আহমদ। তাদের ফয়েজ ভাই, যদিও বয়সে তার বাবার সমান। বিখ্যাত ছড়াকার। সাংবাদিক হিসাবে ডাকসাইটে। দৈনিক আজাদের পক্ষ থেকে রিপোর্ট করতে এসেছেন। কামাল এগিয়ে যায়। আশপাশে আরও দু'একজন রিপোর্টার বন্ধুকে দেখতে পায়। দু'একজন তার

সিনিয়র। এদের কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার। সবাই যে বেতন পায়, তা নয়। কামাল মাঝে মাঝে কিছু টাকা পায়। তা দিয়ে দু-একটা বই কিনতে পারে, হাতখরচও চলে কিছুটা। একস্ট্রা খাতিরটাই আসল বেতন।

'কও, খবর আছে কোনও ইউনিভার্সিটির ?' জিজ্ঞেস করলেন ফয়েজ ভাই। কালোকোলো মোটাসোটা ফয়েজ ভাই। মাথায় টাক পড়ছে, হাসিখুশি।

'না,' মাথা নাড়ে কামাল।

'এরপর ঘেরাও আছে বোধহয় শুনলাম, পারলে কয়েকটা সাইড স্টোরি কইরো।'

'ঘেরাও, সেটা কী!' কামাল জিজ্ঞেস করে।

'দেখবা দেখবা' রহস্যময় হাসি হেসে এগিয়ে যান ফয়েজ আহমদ।

কামাল বন্ধুদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকে। মওলানা সাহেব এলেন একটু পরে। বসলেন মঞ্চে, দুজন পাতিনেতার বক্তৃতার পর উঠলেন। বিকেল পড়ন্ত। সে জন্য বোধ হয় পাতিনেতারা বক্তৃতার সুযোগ পেলো না। সেই লুঙ্গি, সাদা পাঞ্জাবি, মাথায় তালপাতার টুপি। আশ্চর্য, এখানকার আর কোনও রাজনৈতিক নেতাকে এভাবে চলাফেরা করতে দেখেনি কামাল। মওলানা সাহেব নাকি আগে ছিলেন আসামে। সাধে কি সবাই তাঁকে সম্মান করে হুজুর বলে ডাকে।

মওলানা ধীরে ধীরে শুরু করলেন বক্তৃতা। স্বর ওঠানামা করছে। মানুষ নিস্তব্ধ হয়ে শুনছে। বললেন তিনি, রাজবন্দিদের মুক্তি দিতে হবে, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দিতে হবে। এরপর বর্ণনা করলেন কীভাবে পশ্চিমারা শোষণ করছে বাঙালিদের। পূর্ব পাকিস্তানকে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। না দিলে ঘোষণা করলেন তিনি—"এই দাবির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন চলিতে থাকিলে পূর্ব পাকিস্তানবাসী বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন পূর্ববাংলা গঠন করিবে।" প্রবল করতালিতে ফেটে পড়লো পল্টন। অনিল বললো, 'কিরে কাদের, শেখ সাহেব থেকে তো এগিয়ে গেলেন ভাসানী।'

'শেখ সাহেব তো অনেক দিন থেকেই স্বায়ত্তশাসন চাচ্ছেন,' কাদের হার না মানার ভঙ্গিতে বললো, 'হুজুরও তো বললেন স্বায়ত্তশাসন না মানলে স্বাধীনতা চান।'

'আমরা সব পাকিস্তানি', বললো কামাল, 'কিন্তু দেখলি স্বাধীন হয়ে যাওয়ার কথা বলাতে সবাই কী হাততালিটাই না দিল।'

‘মনে মনে বোধহয় সবাই তাই চায়, আমরা বুঝতে পারি না আর কী!’ বললো ইতিহাসের ছাত্র জাহিদ।

‘যাক, মওলানা সাহেব তো শেখ সাহেবের ছয়দফা মেনে নিলেন,’ বললো অনিল।

‘আরে দেখ মুজিব মওলানা সাহেবকে ওস্তাদ মানেন না, সব সময় বলেন হুজুর। তা মুরিদের কথা হুজুর ভুলেন কীভাবে যখন সেই মুরিদ আবার আটক ক্যান্টনমেন্টে।’ হেসে বলে কাদের।

মওলানা ভাসানী সবশেষে ঘোষণা করলেন, “জুলুম বন্ধ না হলে ট্যাক্স বন্ধ”। আবার পুরো ময়দান হাততালিতে ফেটে পড়লো। তুমুল উত্তেজনা চারদিকে। হাততালি থামতেই বললেন, ‘গভর্নমেন্ট হাউস ঘেরাও হবে।’ বেরুলো বিক্ষোভ মিছিল। স্লোগান উঠলো মিছিল থেকে, ‘ঘেরাও ঘেরাও ঘেরাও হবে। গভর্নমেন্ট হাউস ঘেরাও হবে।’ মিছিল এগিয়ে চলে। মিছিলের সঙ্গে কামালরাও এগিয়ে যায়। গভর্নমেন্ট হাউসের মোড়ে পুলিশ আটকে দেয় মিছিল। কথাকাটাকাটি। উত্তেজনা বাড়তে থাকে। জনতার স্লোগান উঠতে থাকে উচ্চ গ্রামে। হঠাৎ পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করে। মওলানা সাহেবকে কয়েকজন ঘিরে ধরে গুলিস্তানের দিকে নিয়ে চলে। কামালরা পিছু হটে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়ায়।

‘ওই দেখ ওই দেখ আবদুল হক,’ বলে ওঠে কাদের। বেশ উত্তেজিত সে।

‘তিনি কে ?’ জিজ্ঞেস করে কামাল।

‘আরে আবদুল হক। যশোরের কৃষক নেতা, আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকেন। আজ বোধহয় মওলানা বলেছেন তাকে আসতে।’

‘তুই চিনলি কীভাবে ?’ জিজ্ঞেস করে জাহিদ।

‘বারে, আমাদের এলাকার লোক না।’ কাদের রাজনীতিতে সক্রিয়। এক-আধটু সবার খবরাখবর সে রাখে।

‘এই জিনিসটা বেশ নতুন হলো, এই ঘেরাও ব্যাপারটা।’ বললো অনিল, ‘এতদিন তো আমরা খালি ধর্মঘট শুনেছি।’

পুলিশ এরি মধ্যে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। মানুষজন ছত্রখান হয়ে যাচ্ছে। মওলানা সাহেবকে ঘিরে কয়েকজন গুলিস্তান মোড় পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। হঠাৎ তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘আগামীকাল হরতাল’। তার সঙ্গীরা তাঁকে একটি গাড়িতে উঠিয়ে দিলো। আর সঙ্গে সঙ্গে স্লোগান উঠলো, ‘হরতাল হরতাল, আগামীকাল হরতাল।’

কামালরা দাঁড়িয়ে ছিলো গুলিস্তানের মোড়ে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। 'তোরা ফিরে যা' বললো কামাল। 'কাল দেখা হবে।'

পকেটে হাত দিয়ে দেখলো কামাল পয়সা-কড়ি কী আছে। না, গোটা পাঁচেক টাকা পকেটে আছে। হাঁটতে ইচ্ছে করছে না, খানিকটা এগিয়ে একটা রিকশা পেলো। দশ আনায় রফা হলো। ঢাকেশ্বরীর সামনে আজাদ অফিস। কিশোরদের জন্য 'মুকুলের মহফিল' নামে আজাদের একটা পাতা বেরোয়। সৈয়দপুর কলেজে পড়ার সময় সেখানে সে লেখা পাঠাতো। প্রায় নিয়মিত তার লেখা ছাপা হতো। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর নিজে থেকে আজাদ অফিসে সে পরিচিত হয় মুকুলের মহফিলের পরিচালক হাবিবুর রহমান ওরফে বাগবান ভাইয়ের সঙ্গে। হাবিবুর রহমানের ছোটদের লেখা বইগুলো সে ছেলেবেলায় পড়েছে— 'বনবাদাড়ে', 'ল্যাজ দিয়ে যায় চেনা'। প্রথম পরিচয়ে বাগবান ভাইকে সে কথা বলাতে তিনি খুব খুশি। লেখা দিতে বলেন নিয়মিত। খুব স্নেহ করেন কামালকে। বাগবান ভাইয়ের সুপারিশেই সে বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার হয়েছে।

অফিসে তুমুল উত্তেজনা। চারদিকে ব্যস্ততা। আগামীকালের হরতাল উত্তেজনা বাড়িয়ে দিয়েছে। সেটিই বোধহয় হেডলাইন হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তেমন কোনও খবর নেই। এদিক সেদিক বসে চা খেয়ে খানিকটা গল্প করে কামাল বাসার দিকে রওনা হলো।

ঘেরাও আর পুলিশের লাঠিচার্জের পর শহর নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। রিকশার দেখা নেই। ঢাকেশ্বরীর মোড় থেকে লোকঠাসা একটা বাসে উঠে শাহবাগ পর্যন্ত এলো। তারপর হাঁটা শুরু করলো ফুটপাত দিয়ে। দু'দিকে সেগুন গাছের সারি। ঠান্ডা লাগছে। এই জায়গাটা খুব ভালো লাগে কামালের। রমনার মোড়ে পৌঁছে সেগুনবাগিচার মাঝ দিয়ে শর্টকাট করে পৌঁছালো বিজয়নগর। দশটার বেশি বাজে। এতো দেরি সাধারণত তার হয় না।

গেট খুলে ভেতরে ঢুকে দেখলো, বাবা পায়চারি করছেন। তাকে দেখেই বললেন, 'কোথায় ছিলি, শহরে নাকি গন্ডগোল হয়েছে।'

'চিন্তা করবেন না আব্বা,' বলে কামাল, 'শহরে তো প্রতিদিনই ঝামেলা হচ্ছে। গভর্নমেন্ট হাউস ঘেরাও হয়েছিলো।'

দু'জনের গলার স্বর শুনে বেরিয়ে আসেন জহুরুল হক, 'বাবা, কী হয়েছে বললে,' জিজ্ঞেস করেন তিনি।

'মওলানা সাহেব গভর্নমেন্ট হাউস ঘেরাও করেছিলেন।'

'এ রকম তো আগে শুনিনি,' একটু চিন্তিত স্বরে বললেন তিনি, 'রেলটেল বন্ধ হবে না তো ?' তার ডিউটি কমলাপুর রেলস্টেশনে।

'আগামীকাল হরতাল,' ঘোষণা করলো কামাল।

'মানে, সে তো আরেক ঝামেলা,' বললেন আবদুর রহিম।

'পুলিশের নির্যাতনের বিরুদ্ধে হরতাল,' বললো কামাল।

দোলা এসে দাঁড়িয়েছে তার বাবার পাশে। তাকে দেখে কামাল একটু নিশ্চিন্ত হলো, যাহোক দুপুরের কথা বোধ হয় মনে রাখেনি।

'রহিম সাহেব,' বললেন হক সাহেব, 'তাহলে কাল সকালে উঠেই হাঁটা শুরু করতে হবে। একটু এক্সারসাইজটা দরকার। না হয় ডায়াবেটিস হতে পারে,' রসিকতা করে বললেন তিনি।

'হু,' চিন্তিতভাবে মাথা নাড়েন রহিম সাহেব। তারপর কামালের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যা খেতে যা, তোর মা জেগে আছে।' তিনি আর হক সাহেব পা বাড়ালেন ঘরে যাওয়ার জন্য।

'আগামীকাল আর কলেজ যেতে হবে না', উপদেশের গলায় দোলা বললো কামাল, 'বাসায় বসে পড়াশোনা কর।'

'অন্যকে উপদেশ না দিয়ে নিজে সে কাজটি শুরু করলে ভালো হতো না ? ফার্স্ট ইয়ারে তো প্রায় অক্কা মেরেছিলি।'

'মেলা বকবক করিস না, তুই মেয়ে মানুষ দিন-দুনিয়ার কি বুঝিস। দেখছিস না শহরটা কেমন বদলে যাচ্ছে।'

'কেমনে বুঝব, মেয়ে মানুষ না, যাক তোর বন্ধু, ওই যে অনিলদা নাকি লেখেটেখে। দেখাস তো তার দু'একটা লেখা বা আমাকে দেখাতে বলিস।'

কামাল কড়া চোখে তাকায় দোলার দিকে। তারপর সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়। কয়েক ধাপ উঠে একবার পেছন ফেরে। দেখে ল্যান্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে দোলা।

ই

'আম্মা খাবার দাও,' কোনও রকমে হাত মুখ-ধুয়ে খাবার টেবিলের সামনে এসে বললো কামাল।

'এই তো খাবার নিয়ে বসেই আছি। তুই কোথায় কোথায় থাকিস। শুনছি গন্ডগোল হচ্ছে, কী বিপদে পড়িস চিন্তায় ঘুম আসে না।'

'অত চিন্তা করো না মা,' বলে কামাল, 'এই যে শুরু হলো এটা চলবে অনেক দিন, পুলিশের অত্যাচারটা দেখছো না। একতরফা সব মেনে নিলে আমরা আর থাকতে পারবো না।'

'কী জানি বাপু, কিছুই বুঝি না,' শ্বাস ফেলে বলেন মা।

ঝটপট খেয়ে নিজের ঘরে ঢুকলো কামাল। কী করা যায়। ক্লাসের পড়া পড়বে ভাবলো একবার। কিন্তু মন বসে না। ক্লাসও হয় না নিয়মিত। 'কচি ও কাঁচা'র জন্য একটা লেখা দিতে বলেছিলেন দাদাভাই। টেবিলে বসে ভালো লাগলো না। পত্রিকাটা হাতে নিয়ে একবার শিরোনাম দেখলো। মন বসলো না। সারাদিন ছোটাছুটি করেছে। ক্লান্তও লাগছে।

দিন কত তাড়াতাড়ি চলে যায়, বাতি নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে ভাবলো কামাল। প্রথমে ছিলো তারা চাঁটগায়। কী সুন্দর নিরিবিলি শহর। পাহাড়তলি রেলওয়ে হাইস্কুলে পড়তো। ক্লাস এইটে পড়ার সময় বন্ধু-বান্ধব ছেড়ে চলে যেতে হলো সৈয়দপুর। বাবার রেলওয়ের চাকরি, বদলি হতে হয় ঘনঘন।

সৈয়দপুর ভালো লাগেনি কামালের। ছোট শহর, রেলওয়ের অফিস, কর্মচারীদের নিয়ে গড়ে উঠেছে। অধিকাংশ অবাঙালি। আবদুর রহিম বাসা পেলেন তার এক কালের চেনা জহুরুল হকের বাসার পাশে। আশপাশে আরও কিছু অবাঙালি পরিবার। সৈয়দপুর হাইস্কুলে ভর্তি হলো। ছাত্র তেমন নেই। স্কুল ছুটির পর আশপাশের বাঙালি পরিবারের ছেলেমেয়েরা ছোট এক চিলতে মাঠে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছোটাছুটি করে। অবাঙালি ছেলেদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলা সূত্রে দেখা হয়। তারা বিন্দুমাত্র বাংলায় কথা বলার চেষ্টা করে না।

এখানেই কামালের পরিচয় দোলার সঙ্গে। সে তখন পড়ে ক্লাস সিক্সে, একরত্তি মেয়ে। দু'এক বছরের বড় ছোট, সবাই সবাইকে তুই-তুমিই বলে। পাশাপাশি থাকায় বই দেওয়া নেওয়া, ক্যারাম, লুডু খেলা, ঝগড়া-ঝাটি সবই চলতো। কামাল তুই বলার সঙ্গে সঙ্গে দোলাও তুই বলা শুরু করেছে। সেটা এখনও বদল হয়নি। কামালের মাঝে-মাঝে খুব অস্বস্তি লাগে। আফটার অল সে ভার্সিটির ছাত্র, দোলা কলেজের। বন্ধু-বান্ধবদের সামনে দোলা সম্বোধনটা বদলালেও পারে। কিন্তু তাকে বোঝাবে এমন বান্দা কেউ নেই। সে সময় তারা মেতে উঠেছিলো ডিটেকটিভ আর রহস্য উপন্যাস নিয়ে। প্রথমে আট আনা সিরিজের স্বপন কুমার, তারপর দেড় টাকায় দস্যু বাহরাম আর দস্যু মোহন। অনেক সময় দুজনের পয়সা দিয়ে বইগুলো

কেনা হতো। এটা মনে পড়তেই নিজের মনে হেসে ফেলে কামাল। সে বইগুলো যে আজ কোথায়!

দেখতে দেখতে এইচএসসি পাস করে ফেললো কামাল। ঠিক করলো ঢাকায় পড়বে, আব্বা আম্মা রাজি না। এক মাত্র ছেলে কোথায় যাবে, কোথায় থাকবে, কোথায় খাবে। চিন্তার কী শেষ আছে। সৈয়দপুরে স্কুলেই সায়েন্স গ্রুপের কামালের আরেক বন্ধু ফেরদৌস যাবে ঢাকায়। তার খালার বাসা আছে। আপাতত ফেরদৌস সেখানেই উঠবে। কামালও সঙ্গী হলো তার। ফার্স্ট ডিভিশন না পেলেও কাছাকাছি ছিলো কামালের রেজাল্ট। ঝামেলা হলো না। ভর্তি হয়ে গেলো রাষ্ট্রবিজ্ঞানে, সাবসিডিয়ারি ইতিহাস আর ইংরেজি। সিট পেলো এসএম হলে।

বছর দুয়েকের মধ্যে জহুরুল হকও বদলি হয়ে এলেন। গোপীবাগে বাসা নিয়েছিলেন। দোলা এসএসসি পাস করেছে, ফার্স্ট ডিভিশনে। ভর্তি হয়েছে ইডেনে। কামাল দেখা করতে গিয়েছিলো। কামিজ পরা, হঠাৎ বড় হওয়া দোলা প্রথম প্রথম লজ্জা পাচ্ছিলো। তারপর যেই কী সেই। দুপুরে খেয়ে অনেকক্ষণ গল্প করেছে, যার শুরু নেই, শেষ নেই। বিকেলে বেরুবার সময় হক সাহেব বললেন, 'তুমি তো ছেলের মতো, যখন খুশি এসো।' তা কামালের খুব একটা যাওয়া হয়নি। মাঝে-মাঝে গেছে, কখনও দোলার সঙ্গে দেখা হয়েছে, কখনও হয়নি। এর কয়েক মাস পর রহিম সাহেবও বদলি হলেন ঢাকায়। দু'বন্ধু মিলে তখন পল্টনের এই দোতলাটা ভাড়া নিলেন। কামালও হল ছেড়ে চলে এসেছে এখানে। বন্ধুদের কেউ হলে, কেউ আত্মীয়-স্বজনের বাসায়। তার কাছাকাছি কাদের আছে, তার খালার বাসায় সেগুনবাগিচায়, অনিল জগন্নাথ হলে। ফেরদৌস মগবাজারে তার সেই খালার বাসায়, শাহরিয়ার মহাখালীতে আর আলী ইমাম ঠাঁটারিবাজারে নিজেদের বাসায়।

প্রথম বছরটা ভালোই কেটেছে, দ্বিতীয় বছরও খুব একটা ঝুট-ঝামেলা ছিলো না। এমনকি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা অব্দিও খুব একটা ঝামেলা হয়নি। একটা গুমোট ভাব ছিলো অবশ্য। কিন্তু ক্লাসটেলাস চলেছে। শেখ মুজিব ও বাঙালিদের শিক্ষা দেয়ার জন্য আইয়ুব সরকারের মতে, ভারতের সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে আলাদা করে ফেলাই ছিল এ ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য। আগরতলা মামলার শুনানি শুরু হলো ১৯ জুন। তখন থেকে মনে হয় আবহাওয়া পাল্টাচ্ছে। পত্রিকায় প্রতিদিন আসামিদের জেরার বিবরণ ছাপা হচ্ছে। কামালউদ্দিনের ওপর নির্যাতনের বিবরণ পড়ে

অনেকে চোখের পানি রাখতে পারেনি। আইয়ুব খান উন্নয়নের দশক শুরু করেছেন, লাহোরে ছাত্রদের সঙ্গে কী এক ঝামেলা শুরু হলো। মওলানা ভাসানী মাঠে নেমেছেন। কী জানি কী হয়। এখানে তিনিই একমাত্র মাঠে। বাকি সবাই জেলে।

না, ঘুম আসছে না। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো কামাল। চারদিকে নিকষ অন্ধকার। রাস্তার পাশে মিটমিট করে জ্বলছে একটি বাতি। চারদিক নিস্তব্ধ যেন কেউ আসবে, তারই প্রতীক্ষায় সবাই। হঠাৎ চার-পাঁচটি ছেলের হেঁড়ে গলায় চিৎকার শোনা গেলো—হরতাল হরতাল আগামীকাল হরতাল। রাতের নিস্তব্ধতা চুরমার করে চারদিকে শব্দগুলো ছড়িয়ে পড়লো। বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লো কামাল।

ঈ

ঘুম ভাঙলে দেখলো কামাল, চারদিক ঝলমল করছে। ঘড়িতে প্রায় ৯টা। অনেক ঘুমিয়েছে। ক্লান্ত ছিলো বোধ হয়। এখন ঝরঝরে লাগছে। মনে পড়লো আজ হরতাল, লাফ দিয়ে বিছানা ছেড়ে, 'আম্মা নাস্তা' বলে ঢুকলো বাথরুমে। গোসল সেরে ঝটপট জামা-কাপড় পরে নাস্তা করতে করতে কাগজ ওল্টাতে লাগলো। হরতাল তছনছ করতে মোনেম খান ১৪৪ ধারা জারি করেছেন। তার মানে ঝামেলা নিশ্চিত। দুঢোক চা খেয়ে দ্রুত সিঁড়ি ভাঙলো কামাল। ছুটলো গেটের দিকে... 'এই যে সাংবাদিক সাহেব, হরতাল ডেকে নিজে সকাল ১০টায় চলছেন হেলেদুলে, আর আমাদের তো পড়াশোনা বন্ধ...' বেশ উঁচু গলায়ই বলছে দোলা। আচমকা গাড়ি যেভাবে ব্রেক কষে, কামালও থামলো সে ভাবে।

'কিছুদিন পড়াশোনা বন্ধ থাকলে এমন কিছু হবে না। আর তোর যা মাথা। পড়াশোনা হলেও তার আর কত উন্নতি হবে ?' বললো কামাল।

'তা ঠিক তা ঠিক,' হেসে হেসে বেশ সুর তোলার ভঙ্গিতে বললো দোলা, কামাল এক কদম ফিরে তার মুখোমুখি, 'কিন্তু কামাল সাহেব তাড়াহুড়ায় বোধহয় আপনি ভুলে গেছেন আমি ফার্স্ট ক্লাস, আপনি সেকেন্ড ...'

কথাটা একেবারে আঁতে লাগে। কামাল আবার ঝট করে কোনও কথা না বলে এগিয়ে যায়। গেট খুলে বাইরে আসে। এক থেকে দশ পর্যন্ত গোনে। শুনেছে, হঠাৎ রাগ হলে এক থেকে দশ বিশ পর্যন্ত গুনলে রাগ

'এই যে সাংবাদিক সাহেব, হরতাল ডেকে নিজে সকাল ১০টায় চলছেন হেলেদুলে'

কমে। কথাটা সত্যি। এইচএসসি-তে কামাল সেকেন্ড ডিভিশন, আর এসএসসি-তে দোলা ফার্স্ট ডিভিশন। রাস্তাঘাটে মানুষজন হাঁটাহাঁটি করছে। দু'একটা রিকশা গলি ছেড়ে বেরুবার চেষ্টা করেছিলো, পাড়ার ছেলেরা হাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। বিজয়নগর পার হয়ে সেগুনবাগিচার গলি ধরে ইউসিসের কাছে পৌঁছলো কামাল। তারপর খানিকটা হেঁটে কার্জন হল। এখানে সেখানে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ হলো কলাভবন। দু'একজন পরিচিতের সঙ্গে দেখা হয়। কামাল পৌঁছে মধুর ক্যান্টিনে। জমজমাট অবস্থা। এনএসএফ ছাড়া সব দলের নেতা-কর্মীরা আছে। চা নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা চলছে। মুহসীন হল থেকে ছোট একটা মিছিল ঢুকলো কলাভবনে। নেতা-কর্মীরা কেউ কেউ আড্ডা ছেড়ে বাইরে এলো। তারপরই হঠাৎ দেখা গেলো, বিভিন্ন জায়গা থেকে ছোট ছোট মিছিল বেরুচ্ছে। কলাভবন থেকে একটি মিছিল বেরুলো। ভিসির বাসার সামনাসামনি আসতেই পুলিশ লাঠি নিয়ে তাড়া করলো। কামাল ছিলো পিছে। সে এক দৌড়ে গেটের থামের আড়ালে দাঁড়ালো। তারপর দেখা গেলো বিভিন্ন গলি, ফাঁক-ফোকর থেকে মিছিল বেরুচ্ছে। স্লোগান চলছে। পুলিশ খানিকটা দিশেহারা। টিয়ার গ্যাস ছোড়া শুরু করলো পুলিশ। নীলক্ষেত থেকে হঠাৎ গুলির শব্দ। খুব সম্ভব নীলক্ষেত থেকে মিছিল বেরিয়েছিলো। নীলক্ষেতে লাশ পড়েছে, মুখে মুখে ছড়িয়ে গেলো। মিছিলগুলো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। পিছু হটতে থাকে পুলিশ। কলাভবন থেকে কামাল কার্জন হলের দিকে ছুটতে থাকে। পেছনে গুলিস্তানে গুলি চলেছে। সেই চেনা শহরটা অন্যরকম হয়ে যায়। সব রাস্তায়ই জনতা, পুলিশ, টিয়ারগ্যাস, টুকরো ইঁট, কাতরাতে থাকা মানুষ, লাশ হয়ে যাওয়া মানুষ। ভয়ে কামালের গা ছমছম করে। কার্জন হল পেরিয়ে, বকশিবাজারের ভেতর দিয়ে, ঢাকেশ্বরীর পাশ কাটিয়ে আজাদের সামনে পৌঁছে। সেখানেও মানুষের ভিড়, সবাই জানতে চায় কোথায় কী হয়েছে—এক রিপোর্টার জানালো, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি হয়ে গেছে। বিরোধী দল বেরিয়ে গেছে পরিষদ থেকে। কামাল ভেতরে গিয়ে বসে। খানিক পর পর খবর আসছে। সেক্রেটারিয়েটের গেটে গুলি চলেছে। না, গুলিও রাস্তা থেকে মানুষকে হটাতে পারেনি। তিনটে চারটের দিকে শোনা গেলো নবাবপুরে জনতা আবার নেমেছে। এক রিপোর্টার মোটরসাইকেল স্টার্ট দিচ্ছেন, যাবেন সেখানে। কামাল বললো, 'আমিও যাব।' উঠে বসলো পিছে। গুলিস্তানের কাছে এসে দেখা গেলো তুলকালাম

কান্ড। ক্ষিপ্ত মানুষজন কিছুই মানছে না। হাতের কাছে যা কিছু পাচ্ছে তাই ছুঁড়ছে পুলিশের দিকে। হঠাৎ গুলির শব্দ। কামাল ঝট করে নেমে গুলিস্তানের পেছনে ডাকবাংলোর আড়ালে চলে গেলো। শোনা গেলো তিনজন মারা গেছে। কামালের হাত-পা হিম হয়ে গেলো। পুলিশের সঙ্গে মারপিট হয় ঠিক আছে। কিন্তু গুলি করে মানুষ মেরে ফেলা। একদিনে কতজন মারা গেলো। ডাকবাংলোর আড়াল ছেড়ে গোলাপ শাহ মাজারে এসে একটি রিকশা পেল। ছুটছে রিকশা হয়তো মালিকের কাছে ফেরত দেবে। পল্টনে কামাল নেমে কোনও রকমে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলো। দরজা খুলে মা বললেন, 'এ কী অবস্থা, খাবি না।' কামাল শুধু বললো, 'না, ভালো লাগছে না।' ঘরে এসে শুয়ে পড়লো। বুঝলো হু হু করে জ্বর আসছে। মনে হলো একবার মা এসে কপালে হাত রাখলেন।

ঘুম ভাঙলো অনেক দেরিতে, মুখে বিষাদ ভাব। বাতি জ্বালিয়ে ঘড়ি দেখলো। রাত দশটা। খিদেও লেগেছে। খাওয়ার ঘরে এসে দেখে খাওয়ার টেবিল ঘিরে দুই ফ্ল্যাটের সবাই বসে আছেন। সামনে রেডিও। উদ্বিগ্ন। মাঝে মাঝে কথা বলছেন। রহিম সাহেব বললেন, 'কিরে তোর শরীর খারাপ কেনো। আয় খাবি কিছু। আগে বল তোর ইউনিভার্সিটির খবর।' কামাল থেমে থেমে বর্ণনা দিচ্ছে। এমন সময় হক সাহেবের পিয়ন এসে হাজির। হক সাহেব অবাক। এতো রাতে ? 'স্যার, আগামীকাল সারাদেশে হরতাল,' জানালো পিয়ন করিম, 'মওলানা সাহেব এই জুলুমের বিরুদ্ধে ডেকেছেন, সব পার্টিই সাপোর্ট করেছে।' বলেই হুট করে চলে গেলো করিম।

হক সাহেব ও রহিম সাহেব দু'জনই খুব চিন্তিত। খবর এসেছে আজ জনাপাঁচেক নিহত। আহত অনেক। কালকেও এ রকম ঘটতে পারে। তারা হরতালের সাপোর্টার কিন্তু অফিসে না গেলে মোনায়েম খান চাকরিও খেতে পারে। হঠাৎ রহিম সাহেব বলেন, 'কামাল, আগামী কয়েক দিন ঘর ছেড়ে বেরুবে না।' তার মনে হলো এই মাত্র, একমাত্র ছেলে, হঠাৎ গুলি খেলে কী হবে ? সঙ্গে সঙ্গে দোলার দিকে তাকিয়ে হক সাহেবও বললেন, 'তোমার ওপরও একই নিষেধাজ্ঞা। যে গন্ডগোল চলছে, কখন কী হবে কেউ জানে

'আরে, আমার ওপর তো সব সময় ১৪৪ ধারা জারিই আছে,' হেসে বলে দোলা, 'এটা আর নতুন কী!' সবাই হেসে ফেলে। পরিবেশটা একটু হালকা হয়। হক সাহেবরা যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ান। দোলা কামালের কাছে এসে নিচু গলায় বলে, 'কি ১৪৪ ধারা ভাঙবি না ?'

দোলা কামালের কাছে এসে নিচু গলায় বলে, 'কি ১৪৪ ধারা ভাঙবি না?'

উ

পরদিন জ্বর নেই। যেমনটি আচমকা এসেছিলো তেমনি আবার চলে গেছে। কিন্তু শরীরটা দুর্বল। অনেকক্ষণ শুয়ে থাকলো কামাল। খবরের কাগজটা পড়লো ধীরে-সুস্থে। নিহত আর আহতের খবর। প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মাহবুব মুর্শেদ হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের গান যখন সরকারিভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় তখনও তিনি এর বিরোধিতা করেছেন। আসলে সমাজে এ রকম দু'চারটে মানুষ থাকলে ভরসা হয়, ভাবলো কামাল। কাগজ মাটিতে ফেলে লেখার টেবিলে বসলো। কী ভেবে কাগজ টেনে লেখা শুরু করলো। সামনে ২১ ফেব্রুয়ারি, 'কচি ও কাঁচা'র জন্য একটা লেখা দিতে বলেছেন রোকনুজ্জামান খান, তাদের প্রিয় দাদাভাই। গত কয়েক সপ্তাহ হইচইয়ে কাটলো। সময় বেশি নেই। কিছুক্ষণ লিখলো, ভালো লাগলো না। আবার শুয়ে পড়লো। একটা টেলিফোনও নেই। বন্ধুদের কেউ এলে আড্ডা দেওয়া যেতো। বাইরে যেতে ইচ্ছে করছে না হাঁটার ভয়ে। এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো। মার ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙল কামালের। খেতে ডাকছেন। খেয়েদেয়ে আবার শুয়ে পড়লো কামাল।

ঘুম ভাঙার পর মনে হলো, কী হলো শহরে, কোনও খবর জানা নেই। একবার ভাবলো, দোলার সঙ্গে গিয়ে গল্প করে। পরমুহূর্তে চিন্তাটা বাতিল করলো। মেয়েটার সব ভালো, শুধু গা জ্বালানো কথাবার্তা ছাড়া। আবার কথায় কথায় ঝগড়া লেগে যাবে।

পরদিন হরতাল নেই, সকাল সকাল বেরিয়েছে কামাল। পত্রিকাজুড়ে প্রদেশের নানা অঞ্চলের খবর। সবখানেই পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে। পথে রিকশা-বাস্ কম, এবার একটা সাইকেল কিনতেই হবে, ভাবে কামাল।

আনমনে হাঁটছে। বেল বাজিয়ে একটা রিকশা থামলো পাশে। আনমনা কামাল খেয়াল করেনি, লাফ দিয়ে ফুটপাতে উঠলো। গলা বাড়িয়ে দোলা বলে উঠলো, 'এই ওঠ কলেজে যাচ্ছি।' যাক, হাঁটতে হবে না, কিছু না বলে কামাল উঠলো রিকশায়।

'ভালো করে বস। নামিয়ে দেব পথে, নিশ্চয় পকেটে পয়সা নেই। লজ্জার কিছু নেই।'

'দেখ দোলা,' বললো কামাল, 'তুই যে সব সময় আমাকে তুই-তোকারি করিস, বন্ধু-বান্ধবদের সামনেও, এটা কি ভালো! এক সময় করতি ঠিক আছে। এখন আমি ভার্সিটির সেকেন্ড ইয়ারে, তুই কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে। কেমন দেখায় বল তো।' দোলা চুপচাপ কথা শুনছে।

'আর এইভাবে কথা বলিস কেন ?' উৎসাহ পেয়ে বললো কামাল, 'ভালোভাবে কথা বলা যায় না। সব সময় একটা ঝগড়াটে ভাব। কই আমাদের ক্লাসেও তো অনেক মেয়ে পড়ে, কেউ তো এভাবে কথা বলে না। কিছু কিছু ব্যাপার তো আপনা থেকেই শিখতে হয়।'

দোলা মনোযোগ দিয়ে রাস্তা দেখছে। কামালও রাস্তা দেখছে। হাইকোর্ট পেরুচ্ছে রিকশা।

'ওই যে, ওই দেখা যায়,' তুই সম্বোধন না করে বললো দোলা।

'কী ?'

'হাইকোর্ট।'

কামাল এক মুহূর্ত তাকালো দোলার দিকে। গম্ভীর মুখ, যেন হাইকোর্ট দেখানোটা খুব সিরিয়াস ব্যাপার।

'এই রিকশা থামো থামো'। বেশ চিৎকার করে বললো কামাল, থতমত খেয়ে রিকশা থামালো রিকশাওয়ালা কার্জন হলের মোড়ে। রিকশা থেকে নামলো কামাল।

'আরেকটু আগে নামলে হতো না। নামলি তো ঠিক ইউনিভার্সিটির সামনে।' টিপ্পনী কাটল দোলা।

কামাল ফিরেও তাকাল না। হনহন করে হাঁটতে লাগলো। বাংলা একাডেমীর গেটের সামনে আলী ইমাম। চিৎকার করে ডাকলো তাকে। 'আহ কামাল,' খুশি মনে বলে আলী ইমাম, দুজনে ঢুকলো লাইব্রেরিতে। বাংলা একাডেমীর সংগ্রহটা ভালো। প্রায়ই ওরা দুজন এখানে বই ঘাঁটতে আসে। পড়ার জন্য বই নিয়ে যায়। দু'জন কয়েকটা বই ইস্যু করলো, তারপর চললো টিএসসির দিকে। 'সাহিত্যিক আড্ডা' চলছে কয়জন মিলে। শাহরিয়ার, আজমিরি, দিলরুবা, জাহাঙ্গীর, লাকি অনেকেই আছে সেখানে। লেখালেখির কথার মাঝখানে হরতাল, গুলির প্রসঙ্গ ঢুকে পড়ে। এক সময় কামাল বললো, 'যাই পড়াশোনার অবস্থা দেখে আসি।' আর্টস বিল্ডিংয়ের দিকে এগোয় সে।

কামালের একটা ক্লাস ছিলো বারোটায়। ছাত্রছাত্রী বেশি নেই। স্যারও এলেন দেরি করে। পড়াশোনার কথা এগোলো না। স্যার ক্লাস ছেড়ে দিলেন তাড়াতাড়ি।

দুপুরে মধুর ক্যান্টিনে পাকড়াও করলো কাদেরকে খবরাখবর জানার জন্য। কাদের জানালো, খবরাখবর ভালো না। বিভিন্ন দলের ছাত্রনেতারা আলোচনা করছেন। কিছু একটা করার পরিকল্পনা চলছে। আইয়ুব-মোনেমী শাসন আর মেনে নেওয়া যায় না। কথা বলতে বলতে লাইব্রেরির পেছনে শরীফ মিয়ার ক্যান্টিনের দিকে রওনা হলো দু'জন। আট আনা দিয়ে হাফ প্লেট বিরানি, খারাপ লাগে না। এরপর এক গ্লাস পানি খেলেই পেট ভরে যায়। খাওয়ার পর কাদের বললো, 'চল অনিলের খোঁজ করে আসি। কয়েকদিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই।'

জগন্নাথ হলে গিয়ে দেখলো, অনিল ক্যান্টিন থেকে খেয়ে মাত্র ফিরেছে। অনিলের রুমমেট কৃষ্ণ, ফিজিক্সে পড়ে, সেও ছিলো। চারজন মিলে আড্ডা দিলো। কাদের আড্ডার শেষে বললো, 'আমাদের মধ্যে যোগাযোগটা থাকা ভালো, কামাল তো আমার কাছেই থাকে। অনিলই একটু দূরে পড়ে গেলি।'

তিনজন হল ছেড়ে বেরুলো টিএসসির দিকে। শামসুন নাহার হলের সামনে দেখা মিলির সঙ্গে। কামালই ডাকে, 'এই মিলি, মিলি,' কামালের সহপাঠী সে।

অনিল কাদেরেরও মুখচেনা। কামাল পরিচয় করিয়ে দিলো।

'আমাদের ক্লাসের প্রথম মানে সেরা ছাত্রী মিলি রহমান। আমার বন্ধু ভবিষ্যতের লিডার কাদের আর ভবিষ্যতের লেখক অনিল রায়।'

'আপনাকে তো আগে দেখেছি, পরিচয় ছিলো না,' বললো কাদের।

'কই যাচ্ছেন আপনারা ?' জিজ্ঞেস করে মিলি।

'কোথায়ও না, হাঁটছি,' বলে অনিল।

'চলেন, আমিও হাঁটবো আপনাদের সঙ্গে।'

রোকেয়া হলের পাশ দিয়ে যে রাস্তা চলে গেছে নীলক্ষেতের দিকে সে রাস্তার ফুটপাত ধরে হাঁটতে লাগলো চারজন। কী হবে সামনে। পড়াশোনায় মন বসে না। পরীক্ষা সামনে, একবারে বন্ধ হয়ে গেলে ইউনিভার্সিটি তাও চলতো।

নীলক্ষেতের কাছে এসে কাদের বললো, 'আমি যাইরে, পার্টি অফিসে একটু কাজ আছে।'

'আমিও যাব, ইকবাল হল। দেখি ওবায়েদকে পাই কি না।' বললো অনিল। ওবায়েদ ছাত্র ইউনিয়নের মেনন গ্রুপের নেতা। ছাত্রনেতাদের ঘাঁটি এখন ইকবাল হল।

'খবর পেলে জানাস,' বলে কামাল, 'চলো মিলি তোমাকে এগিয়ে দিই।'

'তোমার পড়াশোনা কেমন চলছে কামাল ?' জিজ্ঞেস করে মিলি।

'পড়াশোনা, মন বসে না।'

'মন না বসলে চলবে ?'

কথার জবাব না দিয়ে কামাল বলে, 'চা খাবে, চলো।'

হাঁটতে হাঁটতে লাইব্রেরির সামনে আসে। লাইব্রেরির বারান্দায় মিলিকে বসতে বলে কামাল শরীফ মিয়ায় যায় দু'কাপ চা আনতে। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে কামাল বললো,

'তোমার কথার জবাব দিই। পাস করে আমি কী করব ? আমরা যে ডজন-ডজন পাস করছি, চাকরি পাচ্ছি কয়জন ?'

'এ সবই সত্যি। কিন্তু, এটাও সত্যি যে, ডিগ্রি এবং তারপর চাকরি পাওয়ার জন্য সবাই পড়ছ। যখন পড়ছই তখন ভালো করে পড়। সিএসপি যে হবে না কে জানে। যা-ই করো প্রথম হও।'

'ওটা তোমার বাঁধা। তা ছাড়া আমি কোট-টাই পরা জেন্টলম্যান হতে চাই না। পাস করে একটা চাকরি পেলেই খুশি। তবে সরকারি চাকরি করবো না। বাপ-চাচাদের তো দেখছি।'

'কী করবে ?'

'সাংবাদিকতা।'

'সাংবাদিকরা বেতন পায় ঠিকমতো ? আমি তো শুনেছি ঠিকমতো বেতনও পায় না।'

'না পাক, জব স্যাটিসফেকশন তো আছে। শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, আহসান হাবীব এরা পত্রিকায় চাকরি করছেন না ? ঢাকা শহরের লেখকদের একটা বড় অংশই তো পত্রিকায় চাকরি করে। তা ছাড়া আমি লেখালেখি নিয়ে থাকতে চাই।'

'তাও বটে, যার যা ভালো লাগে তার তাই করা উচিত।'

'শোন মিলি,' চায়ে চুমুক দিয়ে বলে কামাল, 'সবাই সব চাইলেই হয় না। আমি কি চাইলেই পরীক্ষায় তোমার মতো প্রথম হতে পারবো ?'

'পড়লেই পারবে। কিন্তু আমি তোমার মতো লেখক হতে পারবো না।' হেসে বলে মিলি।

'তুমি আমার লেখা দেখেছো ? পড়েছো ?' অবাক হয়ে বলে কামাল।

'আমাদের ক্লাসে একজন লেখে আর আমরা মেয়েরা জানবো না তা কেমন করে হয়,' খিলখিল করে হেসে ফেলে মিলি। চায়ের কাপ নামিয়ে রাখে, 'তোমার দৈনিক পাকিস্তানের গল্পটা ভালো হয়েছে।'

কামাল খুশিতে আটখানা হয়ে ওঠে। খপ করে মিলির হাত ধরে বলে, 'এ কথার পর তোমায় আরেক কাপ খাওয়াব।' তারপর অপ্রস্তুত হয়ে হাত ছেড়ে চায়ের কাপ দুটি তুলে আবার শরীফ মিয়ার দিকে রওনা হয়। মিলি হাসতেই থাকে।

কামাল দু-কাপ চায়ের সঙ্গে মাখন দেওয়া দুটি টোস্ট বিস্কিটও নেয়। দৈনিক পাকিস্তানের সাহিত্য পাতার সম্পাদক কবি আহসান হাবীবের কাছে দুরুদুরু বুকে মাস দুয়েক আগে একটা গল্প দিয়েছিলো। এটি তার তিন নম্বর গল্প। আগের দুটো ছাপা হয়েছিলো সংবাদে। কাউকে জানায়নি। জাঁদরেল সম্পাদক। নামি লেখকদের লেখাও পছন্দ না হলে ফেরত দেন। কিন্তু কামালের গল্পটি ছেপেছেন তিনি গত সপ্তাহে। রাতে শুয়ে যে কতবার ছাপার অক্ষরে নিজের লেখাটি পড়েছে কামাল! সেই গল্প আর কারও চোখে না পড়লেও তাদের সেরা ছাত্রী মিলির চোখে পড়েছে!

'কারও চোখে পড়েনি, তোমার চোখে পড়লো,' চায়ের কাপ আর বিস্কুট মিলিকে এগিয়ে দিয়ে বলে কামাল।

'লিখলে এবং ভালো লিখলে কারও না কারও চোখে পড়বেই।' নরম গলায় বললো মিলি।

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো দুজন। সন্ধ্যা নামছে। মিলি বললো, 'হলে ফিরতে হবে, দেরি হলে ঢুকতে দেবে না।'

কামাল চায়ের কাপ ফেরত দিয়ে এলো। মিলি উঠে দাঁড়ালো, বললো, 'তুমি শামসুর রাহমানকে চেন ?'

'হ্যাঁ চিনি।'

'একদিন পরিচয় করিয়ে দিও তো। আমার দুঃখিনী বর্ণমালা নামে যে একখান কবিতা লিখেছেন না। ও রকম দু'একটা লেখা লিখতে পারলে জীবন সার্থক।'

কবিতাটা কামালও পড়েছে। অসাধারণ, তা সবাই কি আর শামসুর রাহমান হয়। মিলি উঠে শাড়ির কুচি ঠিক করে হলের দিকে এগোলো।

কামাল মসজিদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে সোজা রেসকোর্সের মাঝ দিয়ে হাঁটতে লাগলো। খোলা মাঠ। বইছে শীতের হাওয়া। মাঝে মাঝে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আকাশে ম্লান চাঁদ। মাঠ পেরিয়ে একটা রিকশা পেলো। বাসায় ঢুকতে ঢুকতে মনে হলো, তার এতো ভালো লাগছে কেনো ? ঘরে ঢুকেই কেন লিখতে বসতে ইচ্ছে করছে। চারদিকে আন্দোলন, বাতাসে বারুদের গন্ধ, চারদিকে গুমোট ভাব, ঝড় আসার ঠিক আগের মুহূর্ত যেনো। তারপরও তার ভালো লাগছে। শুধু গল্প নয়, প্রবন্ধও লিখতে হবে কয়েকটা।

উ

এরপর দিনগুলো এমনভাবে গেলো যে, দু সপ্তাহ কীভাবে কেটে গেলো টেরও পাওয়া গেলো না। নতুন বছর শুরু হলো। সকালে কামাল রুটিন মতো বেরোয়। কখনও কখনও চকিতে দেখা হয় দোলার সঙ্গে। বারান্দা থেকে দোলা হাত তুলে ভেতরে চলে যায়। কথা টথা তেমন আর বলে না। কখনও কখনও দেখে কলেজ থেকে ফিরছে। 'কী খবর, ভালো ?' এর বেশি আর কথা এগোয় না। এরি মধ্যে হরতাল হয়ে গেলো কয়েকদিন। ফাঁকে ফাঁকে কখনও ক্লাস হয়, কখনও হয় না। তবে মিটিং-মিছিলের বিরাম নেই। আগরতলা মামলার শুনানি শেষ। ফয়েজ ভাইয়ের রিপোর্ট সব মার মার কাট কাট। সেদিন অফিসে আড্ডা দেওয়ার সময় বলছিলেন, আদালতে তিনি শেখ মুজিবকে দেখেও না দেখার ভান করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কারণ বলা হয়েছিলো, বন্দিদের সঙ্গে কথা বললে আদালত থেকে বের করে দেওয়া হবে। শেখ মুজিব সবাইকে শুনিয়ে বললেন, 'ফয়েজ, বাংলাদেশে থাকলে আমার কথা শুনতে হবে।' এখন ভাসানী আর মুজিব ছাড়া কারও নাম নেয় না লোকে।

এরি মধ্যে মওলানা সাহেব নতুন এক আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, 'ঘেরাও'। আগে এ ধরনের আন্দোলনের কথা শোনেনি কেউ। ডিসি এসপি অফিস ঘেরাও হবে মফস্বলে, দাবি মেনে নেওয়ার জন্য। আন্দোলনের নতুন পথ পেয়ে অনেকে খুশি। তবে ছাত্র সংগঠনগুলো দাবি করছে আরও বড় রকমের আন্দোলন গড়ে তুলতে।

নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানানোর জন্য কামাল দোলাদের বারান্দার পাশ থেকে ডাকলো 'দোলা, দোলা' সাড়াশব্দ নেই। ভেতরে যাবে। দো-মনা হলো। একটু খারাপও লাগলো। গেটের দিকে রওয়ানা হলো কামাল।

ফুরফুরে মন নিয়ে বেরিয়েছে কামাল, যাবে দৈনিক পাকিস্তান। কবি আহসান হাবীব একটা লেখা দিতে বলেছেন। পকেটে একটি গল্প নিয়ে বেরিয়েছে কামাল।

আজাদ থেকে দৈনিক পাকিস্তান তার ভালো লাগে। যারা কাজ করে তারা প্রায় সবাই নামি, ছিমছাম। আহসান হাবীবের উল্টোদিকে বসেন মাফরুহা চৌধুরী, গল্প লেখেন, পাশের ঘরে কালো, ছিপছিপে গড়নের আফলাতুন ভাই, সাতভাই চম্পার পরিচালক। সেখানেও নিয়মিত তার লেখা বেরুচ্ছে। কাউকে না কাউকে পাবেই। মাঝে মাঝে দেখা হয় শামসুর রাহমানের সঙ্গে। কালো থোকা চুল, ভারি চশমা, হাসি হাসি মুখ। দৈনিক পাকিস্তানে দেখা আলী ইমামের সঙ্গে। আহসান হাবীবকে গল্পটা দিলো কামাল। তিনি ছোট করে বললেন, 'চা খাবে ?' চা খেলো।

এই ভরদুপুরে কই যাওয়া যায়। আলী ইমাম বললো, 'চলো আমার বাসায় ঠাঁটারিবাজার।' আলী ইমামের রুম চিলেকোঠায়। বইপত্রে ঠাসা। এ ঘরে কামালের ভারি আরাম লাগে। শুয়ে বসে গল্প করতে করতে বিকেল। কামাল বিদায় নিয়ে রওয়ানা হলো পল্টনের দিকে। যাবে নাকি টিএসসির দিকে, যদি মিলিদের কারও সঙ্গে দেখা হয়।

অনিল এসেছে কামালের খোঁজে। কানে এলো সুরেলা গলার গান—আজি প্রাতে সূর্য...।

অনিল দেখলো, বারান্দায় বসে হারমোনিয়াম নিয়ে নিবিষ্ট মনে গান গাইছে দোলা। বারান্দার বাইরে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে শুনলো অনিল। গান শেষ হলে হাততালি দিয়ে বললো অনিল, 'দারুণ'। চমকে তাকালো দোলা, 'অনিলদা' ?

'হ্যাঁ, গান শুনেছি, চমৎকার, আরেকটা গাও।'

'তা বাইরে কেনো, ভেতরে আসো। তোমার বন্ধু বোধহয় গায়ে হাওয়া লাগাতে গেছে,' বলেই, 'আম্মা দরজা খুলে দাও কামালের বন্ধু অনিলদা এসেছে।'

দরজা খুলে দিলেন দোলার মা। অনিলকে দেখে বললেন, 'এসো বাবা এসো'। অনিল বারান্দায় এসে সিমেন্টের মেঝেই বসলো। অনিল বললো, 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা... গাও তো।'

'গাইবো ?' খুশি হয়ে শুরু করলো দোলা। অনিল মুগ্ধ হয়ে শুনছে।

কামাল মন পাল্টেছে। টিএসসি না গিয়ে বাসায় ফিরছে। গেটের সামনে রিকশা থেকে নেমে দেখে কাদের আর শাহরিয়ারও ঢুকছে।

নববর্ষের কোলাকুলি শেষ করে বারান্দা পর্যন্ত আসতেই দোলার গানের শেষ কলিটুকু শেষ হলো। কামাল দেখলো, অনিল একমনে গান শুনছে, বিরক্ত লাগলো। তিনজনের পায়ের শব্দে মুখ তুলে অনিল তাকালো বারান্দার দিকে। চোখাচোখি হতেই কামাল বললো, 'কিরে মুগ্ধ হয়ে গেলি নাকি। আমরা তো প্রতিদিনই ওই হেঁড়ে গলার আওয়াজে বাসায় থাকতে পারি না।' দোলার গালে লালচে আভা। শাহরিয়ার বললো, 'কি যে বলো, শেষটুকু যা শুনলাম ভালোই তো লাগলো।'

'ওয়ান্ডারফুল' বারান্দার ভেতর থেকে বললো অনিল, 'আমি তো অনেকক্ষণ ধরে শুনছি।'

'আয় আয়,' বললো কামাল, 'হেভি আড্ডা দেওয়া যাবে।'

'অনিলদা,' গলা শোনা গেলো দোলার, সবাই সব কিছু বোঝে না। অবশ্য বোঝার কথাও নয়। তোমার পছন্দ হয়েছে তো, তুমি এলেই গাইবো।'

'ওয়ান্ডারফুল ওয়ান্ডারফুল' বলে অনিল উঠলো, 'আয় না' বললো কামাল। বিরক্ত লাগছে তার। একবার তাকালো দোলার দিকে। দোলা সেদিকে না তাকিয়ে চলে গেলো ভেতরে।

আড্ডার বিষয় ফের রাজনীতি। এ ছাড়া এখন যেন আর আলোচনার কিছু নেই। নতুন বছরে কামালের মা'র বিশেষভাবে তৈরি পায়েস, চা খেয়ে তারা যখন উঠলো তখন ন'টা বাজে। গেটের দিকে যেতে যেতে কামাল বললো, 'ডাকসুসহ সবদলগুলো বসছে আলোচনার জন্য। সামনে দিন সুবিধার নয়।'

গেট বন্ধ করে ফিরতে ফিরতে কামালের মনে হলো, সে না সকালে দোলাকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাবার জন্য বেরিয়েছিলো, না, বিকালে মেয়েটার সঙ্গে এমন ব্যবহার করা ঠিক হয়নি। আফটার অল আজ বছরের প্রথম দিন। দোলাদের কলিংবেল টিপলো। দরজা খুলে দিলেন দোলার মা।

'খালাম্মা মেয়েটা কই ?' হাসিমুখে বললো কামাল।

'পড়ছে বোধহয় দেখ' বলে সরে দাঁড়ালেন। কামাল ঢুকলো ভেতরে।

দোলা একমনে পড়ছে। কামালের পায়ের শব্দে চোখ তুলে তাকালো, তারপর আবার মন দিলো বইয়ে। কামাল পিছে এসে বললো, 'সরি দোলা, সকালে তোকে খুঁজলাম শুভেচ্ছা জানাতে, তুই ছিলি না। এই দেখ এখন আবার এসেছি।'

দোলা বই থেকে মুখ তুললো না। কামাল ফের বললো, 'বছরটা যেন ভালো যায়। কখন কি যে হয় জানি না। তাই তো এলাম তোকে জানাতে যে আর কারও না গেলেও তোর জন্য যেনো বছরটা ভালো যায়।'

দোলা কিছু না বলে টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটি খাম বের করে কামালের দিকে ফিরে বললো, 'নে, ধর।'

'কী ?'

'নববর্ষের কার্ড, নিজের হাতে তোর জন্য তৈরি করেছি। নিজ হাতে দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু সময় দিলি কই ?'

'এই তো গুড গার্ল' খুশি হয়ে হাসিমুখে বললো কামাল, এ রকম আচরণটাই তো কাম্য।'

'আচ্ছা কামাল,' বললো দোলা, 'তোর ওই বন্ধুটা, ওই যে অনিলদা, দেখতে বেশ হ্যান্ডসাম না ? আর শিল্প সংস্কৃতিও বোঝে টোঝে।'

'হ্যাঁ, ভালো,' কামালের মুখের হাসি মিলিয়ে গেলো। 'অনিল খুব ভালো ছেলে,' গম্ভীর মুখে বললো কামাল, 'চলি,' কার্ডটা হাতে নিয়ে দরজার দিকে রওনা হলো।

'এসো।' হাসি মুখে বললো দোলা।

গতকালই শুনেছিলো কামাল, ডাকসু কার্যালয়ে ছাত্রনেতারা গুরুত্বপূর্ণ এক ঘোষণা দেবেন। গত কয়েকদিন ধরে ক্যাম্পাসে সেই আলোচনাই চলছে। সকালে কোনও রকমে নাস্তা করে রিকশা নিয়ে এলো কাদেরের বাসায়। কাদেরের বাবা-মা থাকেন যশোর। কাদের এখানে তার ছোট খালা-খালুর বাসায় থাকে। খালার সংসার খুব বড় নয়। ছোট দুই ছেলেমেয়ে। ছোট একতলা ভাড়া বাড়ি। সামনের রুমটাই কাদেরের। কাদেরও ভার্সিটি যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলো। রিকশা দাঁড় করিয়ে কাদেরকে ডাকলো কামাল।

ডাকসু অফিসের সামনে পাতি কর্মী, নেতা আর সাংবাদিকদের ভিড়। আজাদ থেকে সিনিয়র একজন রিপোর্টার এসেছেন। অর্থাৎ কামালের দায়িত্ব কমলো। নির্দেশ পেলে সে রিপোর্ট করবে। ছাত্রনেতারা বসে আছেন। ১১টার দিকে ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক নাজিম কামরান ঢুকলেন। এনএসএফ থেকে নির্বাচিত। ছাত্ররা এনএসএফকে ভয়/ঘৃণা দুটোই করে। নাজিম কামরানকে দেখে তাই সবাই অবাক হলো। তিনি কেনো এখানে। তাহলে কি হাওয়া বদলাচ্ছে ? তোফায়েল আহমদও ঢুকলেন। মাথাভর্তি কালো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। কামালের সঙ্গে তোফায়েলের সামান্য পরিচয়

আছে সাংবাদিক হিসাবে। দীপাদিও আছেন, ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি। নেতারা বক্তব্য দিলেন। শুরু হলো প্রশ্নোত্তর। কয়েকজন কর্মী লিফলেট বিলি করতে লাগলো। লিফলেটেই সব আছে। কামাল একটা সংগ্রহ করে কেটে পড়লো। এটি পড়লেই সব জানা যাবে।

সংবাদ সম্মেলন শেষ। নিমিষের মধ্যে রটে গেলো ছাত্ররা ১১ দফা ঘোষণা করেছে। ছাত্রলীগ ছাত্র ইউনিয়ন আর ডাকসু। সেদিন আর ক্লাস হলো না।

টিএসসিতে লেখক বন্ধুদের পেলো না কামাল। মিলিকে পেলো। চা খাচ্ছে শাহেদের সঙ্গে। শাহেদ ইংরেজিতে পড়ে। সেদিকে যাবে কি যাবে না ভাবছে কামাল। এমন সময় মিলিই ডাকলো, 'এই কামাল এই দিকে... এই দিকে'। কামাল এগোলো।

'বস, চা নিয়ে আসি।' চা আনতে গেলো মিলি।

'কী অবস্থা ?' জিজ্ঞেস করে শাহেদ।

ঋ

'আমাদের ১১ দফা' বলে লিফলেটটা পকেট থেকে বের করলো কামাল। মিলি চা নিয়ে এলো। শাহেদ লিফলেটটা নিয়ে এক ঝলক দেখে বললো, 'আবার উটকো ঝামেলা।' মিলি লিফলেটটা নিয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগলো। শাহেদ মিনিট কয়েক চুপ করে বসে থেকে উঠলো। বললো, 'মিলি তোমরা গল্প কর, আমি একটু ঘুরে আসি।' মিলি জবাব দিলো না। এক নিঃশ্বাসে পড়া শেষ করে কামালকে বললো, 'শেখ মুজিবের ছয় দফার অনেক কিছুই তো আছে।'

'তুমি রাজনীতির খোঁজও রাখো নাকি ?' ঠাট্টার সুরে বললো কামাল।

'রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রী,' হেসে বলে মিলি, 'রাজনীতির খবর রাখব না। শোন, প্রতিদিনই ইতিহাস তৈরি হচ্ছে। ইতিহাসও তো তোমার সাবসিডিয়ারি আমার মতো, খবর রাখো ? জেনে রাখো ঐ ইতিহাসের পাত্র-পাত্রি আমরা।'

'তাই তো,' বললো কামাল, এতটা সে চিন্তা করেনি। বললো, 'এ জন্য তুমি ফার্স্ট বয়, না ভুল বললাম, ফার্স্ট গার্ল। আমি তো ওইভাবে চিন্তা করিনি। আসলেই তো বিষয়টা রোমাঞ্চকর। আর কী মনে হয় তোমার ?'

'তুমি তো ইতিহাসের গিয়াস স্যারের ক্লাসটা ঠিক মতো করো না। শোন, অত রাজনীতি বুঝি না। তবে বুঝি, ছাত্ররা যখন নেমেছে তখন পরিবর্তন হবেই। গত এক যুগে ছাত্ররা যখনই পথে নেমেছে, তখনই ছবিটা বদলে গেছে। এখন রাজনৈতিক দলগুলোও চাপে পড়ে একত্রে কাজ করতে বাধ্য হবে।'

'এই মিলি,' কে যেন ডাকলো। কামাল দেখল তাদের ক্লাসের ফাতেমা, খালেদা এগিয়ে আসছে। তাদের পিছে শাহরিয়ার, আজমিরিও ঢুকছে, কামাল উঠলো। 'আমাদের দেখে উঠছো নাকি ?' দু'জনেই জিজ্ঞেস করে।

'না, চাকরি বাঁচাতে।'

টিএসসি থেকে আজাদে গেলো কামাল। রাস্তায় বেশ ভিড়। অফিসে বেশ উত্তেজনা। কামালের রিপোর্ট করার কিছু নেই। গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর সিনিয়রদের হাতেই।

বিকেলে বাসায় ঢুকেই দেখে আব্বা-আম্মা হক চাচাদের বারান্দায় বসে চা খাচ্ছেন। রহিম সাহেব তাকে দেখে বললেন, 'আয় এ দিকে আয়।'

কামাল ঘরে ঢুকে বললো, 'আপনারা আজ এতো তাড়াতাড়ি ফিরলেন ?'

'না অফিসে মন বসে না। ছাত্ররা নাকি কী ঘোষণা করেছে ?' জিজ্ঞেস করলেন হক চাচা।

'হ্যাঁ' বললো কামাল, '১১ দফা। এই যে লিফলেট।' হাত বাড়িয়ে রহিম সাহেব লিফলেটটি নিয়ে পড়া শুরু করলেন।

'কি মনে হয়,' জিজ্ঞেস করলেন হক চাচা, 'ঝামেলা আরও বাড়বে ?'

'বাড়বে তো নিশ্চয়, কমার তো কোনও কারণ দেখি না।'

লিফলেট পড়া শেষ করে রহিম সাহেব বললেন, 'শেখ সাহেবের ছয় দফাই তো মনে হচ্ছে।'

'ভালোই হলো, শেখ মুজিবের ছয় দফা, ছাত্রদের ১১ দফা, এখন বাঙালি জাগলেই হয়।' যোগ করলেন হক চাচা, 'বাঙালির ঘুম ভাঙানো কষ্টকর।'

'জাগছে জাগছে,' বললেন রহিম সাহেব, 'ঘুম ভাঙলেই তো সঙ্গে সঙ্গে কেউ লাফ দিয়ে ওঠে না। আড়মোড়া ভাঙে, দেখছেন না, গুলি খাচ্ছে, মারা যাচ্ছে, তারপরও মানুষ রাস্তায় নামছে।'

'ঠিক বলেছেন চাচা,' যোগ করে দোলা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে রহিম সাহেবের কথাগুলো শুনেছে, 'আপনারা তো সবই চান, আবার হরতালে অফিসও যান। তাদের কথা ভাবেন, যারা গুলি খাবে মার খাবে জেনেও রাস্তায় নামে।'

অবাক হলেন হক সাহেব, কথাটা ঠিকই, রহিম সাহেবও একটু লজ্জা পেলেন। কামাল অবাক চোখে তাকিয়ে। কাঁচুমাচু করে বললেন হক সাহেব, 'ঠিক বলছিস মা, ছা-পোষা মানুষ। চাকরি গেলে খাওয়াবে কে। মোনেম খাঁর চেলা চামুন্ডাদের সংখ্যা তো কম না।

'না, চাচা ঠিকই বলছেন,' বললো কামাল,। 'সবাই সব কাজ পারে না, আমরা যে যার কাজ করলেই ভালো। দরকারে নিশ্চয় আপনারা রাস্তায়ও নামবেন।'

'আয় কামাল চা খাবি ?' বলে দোলা। সেইদিনের রাতের কথা বেমালুম ভুলে গেছে সে। কামাল ভাবছিলো যাবে কি যাবে না। 'কি ডাকছি না,' বললো দোলা। তাড়াতাড়ি এগোলো। কখন কী বলে ফেলে ঠিক নেই। 'আম্মা চা দাও,' ডাকলো দোলা তারপর নিচু গলায় বললো, 'কার্ডটা দেখেছিলি।'

'না,' মিথ্যে বললো কামাল। সেদিন ঘুমাতে যাওয়ার আগেই সে কার্ডটা দেখেছে। গোটা গোটা অক্ষরে লেখা 'প্রিয় কামাল বেঁচে থেকো ভালো থেকো আর...' সেই 'আরে'র মানে সে উদ্ধার করতে পারেনি।

'তুই একটা কী ? একটা ইলিস্পু ডিলিক য়েসম্পুট টসকট,' রাগের গলায় বললো দোলা।

'সেটি আবার কী ?' জিজ্ঞেস করলো কামাল।

'কেন রাহাত খানের দিলুর গল্পে পড়িস নি ? প্রত্যেকটা শব্দের প্রথম অক্ষর যোগ কর।

কামাল মনে মনে যোগ করলো। শব্দটা হলো 'ইডিয়েট'।

'তোর খাসলত গেলো না।' কামাল রেগে বললো, 'লঘু গুরু জ্ঞান নেই।'

'আবার তোরা শুরু করছিস', দোলার মা বললেন। দু কাপ চা দুজনের হাতে দিয়ে বললেন, 'একটু চুপচাপ চা খা।'

বারান্দায় দু'বন্ধুই চুপচাপ। খানিক পর হক সাহেব বললেন আস্তে আস্তে , 'ছেলেমেয়েগুলো বড় হয়ে গেলো।'

এ

মিলির কথাই ঠিক হলো। ১১ দফা ঘোষণার তিন দিন পর ঠিক ঠিক রাজনৈতিক দলগুলো ঘোষণা করলো তারা একটি ফ্রন্ট করবে। শেখ

মুজিবের বাসায় এই ঘোষণা দেওয়া হলো। এর নাম হলো গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ বা ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি, সংক্ষেপে 'ডাক'। শেখ মুজিব ক্যান্টনমেন্টে বন্দি। দেশদ্রোহিতার মামলায় অভিযুক্ত। তাঁর বাসায়ই যখন বিরোধীদলগুলো ঘোষণা দিলো তখন সবাই ধরে নিলো এবার কিছু একটা হবেই। 'ডাকে'র নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করলেন, দেশে আজ জাগরণ এসেছে, একনায়কতন্ত্র নিপাত যাবে। সন্ধ্যার পরই যেন ঢাকা শহরটা বদলে গেলো।

ভাসানী মাঝখানে ঢাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর দলের নেতাকর্মীরা বিব্রত। ওবায়েদকে একদিন জিজ্ঞেস করলো কামাল ঠাট্টার ভঙ্গিতে, 'কীরে ঢাকায় এতো কান্ডকারখানা আর তোদের লিডার গেলো কোথায় ? গুজব শুনছি আইয়ুব খান নাকি তাঁকে ফোন করেছিলেন।'

ওবায়েদ বললো, 'আর বলিস না, হুজুর যে কখন কী করেন ? আর জবাব দিতে হয় আমাদের।'

ভাসানী কিন্তু ফিরে এলেন কয়েক দিনের মধ্যে। প্রতিদিনই চলছে মিটিং-মিছিল। ক্লাস কখনও হয় কখনও হয় না। বাসায় বসে থাকে কে ? কামাল তো বেরিয়ে যায় সকালেই। দোলাও আরেকটু পরে। বাসায় তার ভালো লাগে না। সারা শহরে কত কিছু হচ্ছে, তার অনেক বন্ধু ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে জড়িত। সারাদিন তারা কলেজেই পড়ে থাকে। দোলা এসব মিস করতে চায় না। দোলা তবুও সন্ধ্যার আগে ফিরে। কামালের কোনও ঠিক ঠিকানা নেই।

একদিন রাত ১১টায় কামাল ফিরে দেখে বাবা ফ্ল্যাটের সামনে পায়চারি করছেন। কামালকে দেখেই যেন প্রাণ ফিরে পেলেন। বললেন, 'এত রাত করিস, চিন্তায় ঘুম আসে না।'

কামাল বললো, 'বাবা চিন্তা করো না। আমার মতো অনেকেরই এখন ফিরতে রাত হয়। রাত ১১টার পর না ফিরলে জেনো আমি হলে আছি। আমার অনেক বন্ধুরা এখন হলে থাকে।'

রহিম সাহেব কিছু বললেন না। ভাবলেন, বাবা না হওয়ার আগে ছেলেদের উপদেশ বা পরামর্শ দেওয়া বৃথা।

এর পরের দশ-বারোদিন যে কীভাবে কেটে গেলো কামাল টেরও পায় না। ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে জড়িত না থাকলেও কীভাবে যেনো সে জড়িয়ে যাচ্ছে সবকিছুতে। তার বন্ধুরাও। ১৭ জানুয়ারিতে ঘটে গেলো আরেক

ঘটনা। 'ডাক' ওইদিন দাবি দিবস ঘোষণা করেছিলো। বিকেলে তাদের মিটিং বায়তুল মোকাররমে। সকালে বটতলায় ছাত্রদের মিটিং।

বটতলায় ভিড় কম হয়নি। মোনেম খানের ১৪৪ ধারা ছাত্রদের দমাতে পারেনি। বটতলার মিটিং সেরে ছাত্ররা মাত্র কলাভবন থেকে বেরিয়েছে অমনি পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়লো তাদের ওপর। কলাভবনের এক কোণে ছিলো ভাঙা ইটের টুকরোর স্তূপ। নতুন দালান তৈরি হওয়ার পর সেগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়নি। ছাত্ররা একটু পিছু হটে টুকরো ইটের পাঁজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঢিল ছুঁড়তে শুরু করে। বৃষ্টির মতো ঢিল পড়তে থাকলে পুলিশ খানিকটা পিছু হটে যায়। কামাল এসব এড়িয়ে চলে। আজ কি যে হলো সেও টুকরো ইট তুলে ছুঁড়তে লাগলো, অন্যদের মতো গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু করলো,' মার ঠোলাদের মার।' 'শালাদের উচিত শিক্ষা দে।' 'ঠোলা' শুনে পুলিশরা আরও ক্ষেপে গেলো। কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে শুরু করলো। ছাত্ররা এবার ছড়িয়ে পড়ে। ভাঙচুর শুরু হয়। হঠাৎ দেখা গেলো ইপিআরের ট্রাক আসছে। ছাত্ররা হটে না, বিভিন্ন রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে। রাগে সবাই ফুঁসছে। লাইব্রেরির মোড়ে বাস থামিয়ে ছিলো ইপিআরটিসির ড্রাইভার। কামাল দেখলো, কাদের ও আরও কয়েকজন বাসে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিলো। কামালের চোখ জ্বালা করছে। কামাল তবুও ছুটলো কাদেরদের দিকে। পেছন থেকে তার শার্টের কলার চেপে ধরে বললো, 'করছিস কী, এখনই গুলি খাবি।' কাদের যেন ঘোরের মধ্যে আছে। কামাল তাকে টানতে টানতে শরিফ মিয়ায় নিয়ে গেলো। গ্লাস গ্লাস পানি ঢাললো চোখে। শরীফ মিয়ার আশপাশে জটলা। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ ফাঁকা। কামাল, কাদেরকে বললো, 'আয় কিছু খেয়েনি।'

তারা দুজন চার হাফ প্লেট বিরিয়ানি খেলো। দু টাকার বদলে এক টাকা দিলো শরীফ মিয়াকে। ছোটখাটো ঢাকাইয়া মানুষটা ঠাট্টা করে বললেন, 'যা খাটাখাটনি খাটতাছেন, দুই প্লেট ফ্রি। যান কওমের খেদমত করেন।'

খানিকক্ষণ জিরিয়ে তারা বায়তুল মোকাররমের দিকে হাঁটা শুরু করলো। আধপোড়া বাসটা সরানো হয়নি। রাস্তায় ইটের টুকরো, দুএকটি পুলিশ এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করছে।

বক্তৃতা তখন শুরু হয়ে গেছে। নেতাদের গরম বক্তৃতা শুনতে শুনতে অনেকে উত্তেজিত। চীনা বাদাম খেতে খেতে কাদের বললো, 'শোন, 'ডাক' মানে তো হাঁস। সময় পেলেই এরা সটকে পড়বে।'

'তুই কাদের কথা বলছিস। তোরাও তো আছিস ডাকে।'

'আছি, থাকবো কিন্তু ফরিদ আহমেদ, নুরুল আমীনরা থাকবে ?'

'তোর এ কথা মনে হচ্ছে কেনো ?'

'শুনে রাখ এরা পাকিস্তানের খাস বান্দা। আমরা বান্দা বটে খাস নই। তুই দেখিস আজ উপায় না দেখে আমাদের সঙ্গে আছে। আফটার অল রাজনীতিবিদ। মানুষের নাড়ি তো বোঝে। মানুষ ক্ষেপে গেছে দেখছিস না।'

বাসায় ফিরতে ফিরতে কামাল ভাবে, কথাটা ঠিক। সে নিজেও তো ক্ষ্যাপার মতো করছে। ক্লাসট্লাস বন্ধ। তবুও কলাভবন না পৌঁছলে অস্থির লাগে। পত্রিকা অফিসেও দেখে অস্থিরতা। শুধু কামাল নয়, কামালের বন্ধু-বান্ধব সবার একই অবস্থা। হলে তো প্রায় সারারাত জেগে চলে আলোচনা, পোস্টার লেখার কাজ। কামাল ভাবে, কয়েকদিনের জন্য হলে চলে আসবে কি না। নেশার মতো হয়ে গেছে।

পরদিনও কলাভবনের সামনে লেগে গেলো ধুন্ধুমার লড়াই। কামালরা কয়েকজন মিলে ক্লাস থেকে বেঞ্চি এনে রাস্তায় ফেলে রাখলো। যাতে পুলিশ সহজে গেট দিয়ে ঢুকতে না পারে। একদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অন্যদিকে ঢাকা কলেজ, আরেকদিকে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি। মিউমার্কেটের সামনে ঢাকা কলেজের ছাত্ররা বাসে আগুন লাগিয়ে দিলো। বাসের প্যাসেঞ্জাররা বাস থেকে নেমে হাততালি দেওয়া শুরু করলো। ইটপাটকেল কাঁদানে গ্যাস চলছেই। কামাল, কাদের, অনিল, জাহিদ এ ক'দিন একত্রেই ঘুরছে। টিয়ারগ্যাসের ঝাপটা খেতে খেতে চোখ লাল হয়ে গেছে। মনে হয় সবকিছু ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলতে।

এ ক'দিন মিছিলে থেকে, টিয়ারগ্যাস খেয়ে কামালের ক্লান্ত লাগছিলো। বাসায় ফিরে গিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। সন্ধ্যার সময় ঘুম ভাঙলো কাদের, জাহিদের ডাকে। জাহিদ বললো, 'ইপিআর হামলা করেছে হলে। পালিয়ে এসেছি, কাদেরদের ওখানে থাকবো।'

'জাতীয় পরিষদ থেকে বিরোধী দলের সদস্যরা বেরিয়ে গেছে,' কাদের জানালো।

চা খেয়ে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করলো তিনজন। রাত একটু বাড়তেই কাদের জাহিদকে নিয়ে বেরিয়ে গেলো। যাবার সময় বললো, 'কামাল দু'একদিন বাসা থেকে বেরোস না। আমরাও একটু গা-ঢাকা দিয়ে থাকবো।'

'ঠিক আছে, ২০ তারিখ বটতলার মিটিংয়ে তো যেতে হবে,' জানালো কামাল।

'তা যাবো,' বললো কাদের।

ঐ

এ ক'দিন বাসা থেকে বেরোয়নি কামাল। শরীরটা চাঙ্গা লাগছে। বটতলায় মিটিংয়ে যাবার জন্য দোতলা থেকে নামলো কামাল।

'এই কই যাচ্ছিস, চাচি না বললো তোর শরীর খারাপ। আজ না বেরুলে হয় না ?' গ্রিলে ঢাকা বারান্দা থেকে গলা শোনা গেলো দোলার।

'কেনো কী হয়েছে ?'

'আজ না ধর্মঘট।'

'ধর্মঘট তো প্রতিদিন'। ধর্মঘট না থাকলেও কি ক্লাস হয় ?'

'না, আজ আমার মনে কু ডাকছে। তুই না হয় না বেরুলি। কালও তো বেরোসনি।'

'কাল শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছিলো। তাছাড়া আজ বটতলায় মিটিং।'

'তুই তো নেতা না,' দোলা নাছোড়বান্দা, 'সাংবাদিক। ছাত্র। সবখানে তোকে থাকতে হবে এমন তো কথা নেই।'

'মেয়েলি প্যাঁচাল রাখতো। সাংবাদিক দেখেই তো আমাকে যেতে হবে। বটতলার রিপোর্ট করতে হতে পারে। তুই যা পড়াশোনা কর। এমন উপকারি বন্ধু পাবি না।'

'কী রিপোর্ট করবি, জানা আছে। হাফ সাংবাদিক, কয়টা রিপোর্ট তোর ছাপা হয় ?'

কামাল জবাব না দিয়ে হাঁটা শুরু করলো। গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে রইলো দোলা। পড়ায় আজ মন বসছে না।

বটতলায় আজ তিলধারণের জায়গা নেই। অনেকের হাতে বাঁশের লাঠি। জ্বালাময়ী বক্তৃতার পর আবার মিছিল। কামাল বন্ধুদের খোঁজ করছিলো। থেমে খানিকটা গল্প করে অফিস যাবে। মিছিলে আজ যাবে না।

প্রায় প্রতিদিনই তো যায়। কাউকে চোখে পড়ছে না। মিছিল এগোচ্ছে কার্জন হলের দিকে, পুলিশ প্রথম বাধা দিলেও সরে গেছে বাংলা একাডেমীর দিকে। পিছে পিছে হাঁটছে কামাল। লাইব্রেরির কাছাকাছি আসতেই সে ভেতরে ঢুকে গেলো। যাবে শরিফ মিয়ায়। একা একা বসে চায়ে চুমুক দিচ্ছে কামাল। এমন সময় উত্তেজিত একদল ছাত্র ছুটে এলো। 'আসাদ মারা গেছে।' 'আসাদ শহীদ'।

যে ক'জন চা খাচ্ছিলো, চায়ের পেয়ালা ফেলে ছুটে বেরিয়ে এলো। 'কোথায় ?' 'কখন' ?

'মেডিকেলে,' কে একজন বললো।

ছুটলো সবাই মেডিকেলের দিকে, কামালও ছুটছে। আসাদকে সে চেনে না। ছুটতে ছুটতেই টুকরো টাকরা কথায় বুঝতে পারলো, ইতিহাসের ছাত্র আসাদ, মেনন গ্রুপের নেতা। মুখে মুখে ছড়িয়ে গেছে এক ছাত্র আহত হয়েছে। নানা দিকে ছুটছে মানুষ। ইপিআরের একটি ট্রাক ছুটছে তার ডালা ধরে দু'জন ইপিআর ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে। উত্তেজিত মানুষ ঢিল ছুঁড়ছে। কয়েকজন এক পুলিশকে পেয়ে মারধর করছে। কামাল ছুটতে ছুটতে মেডিকেলের সামনে এলো। 'শালা মোনেমের দালালদের ধর,' চিৎকার করছে একজন। মেডিকেলের ইমারজেনসির সামনে জটলা। কয়েকজন ছাত্র রক্তমাখা একটি শার্ট নিয়ে বেরিয়ে এলো। মেডিকেল এলাকা খালি হলেও চারদিকে মানুষ নেমে পড়ছে। এসএম হলের পাশে রেল লাইনে ব্যারিকেড দেওয়া হয়েছে। গুলিস্তানে পুলিশ কয়েকজনকে টেনেহিঁচড়ে ট্রাকে তুলছে। এদিক সেদিক গুলিও চলছে। একদল ছাত্র 'মোনেমশাহী নিপাতযাক' 'হরতাল হরতাল আগামীকাল হরতাল' স্লোগান দিয়ে মিছিল নিয়ে এগুচ্ছে কলাভবনের দিকে। জগন্নাথ হলের সামনে থেকে দেখলো অনিলের নেতৃত্বে আরেকটি মিছিল বেরিয়েছে। কামাল সে মিছিলে ঢুকে গেলো। কলাভবনে বিভিন্ন জায়গা থেকে মিছিল আসছে। হঠাৎ দেখলো, কাদের বাঁশের ডগায় এক কালো পতাকা তুলে এগিয়ে আসছে। তাকে সাহায্য করছে আরও কয়েকজন। কামাল মিছিল ছেড়ে কাদেরের কাছে গিয়ে বললো 'কী করবি ?'

'কালো পতাকা ওঠাবো।'

কামাল চললো কাদেরের পিছু পিছু। কলাভবনের সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠলো তারা। লোহার এক লম্বা খুঁটির সঙ্গে বাঁধলো। কালো পতাকা উড়তে লাগলো। নিচে জড়ো হওয়া ছাত্ররা স্লোগান দিলো 'হরতাল হরতাল।'

'আমি যাবো।' কামালের হাত ধরলো দোলা, 'না নিলে চিৎকার করে কাঁদবো।'

কামাল কাদেরকে নিয়ে নামলো। তারপর অনিলকে নিয়ে হাঁটতে লাগলো। কেউ কথা বলছে না। কার্জন হলের সামনে অনিল বিদায় নিলো। কাদের বললো, 'কী করবি'।

'বাসায় যাবো।'

'বিকেলে আয়, শোক মিছিল বের করবো।'

দুজন আবার হাঁটতে লাগল। সেগুন বাগানের মোড়ে কাদের বিদায় নিল। চারদিকে জটলা। সবাই খবরাখবর জানতে চাচ্ছে। পুলিশের টহলদারি একটু কম। রাস্তায় কিছু রিকশা দেখা যাচ্ছে। অনেকে দোকানপাট বন্ধ করে দিয়েছে। অবসন্ন কামালও বাসার গেট খুললো।

দোলা দাঁড়িয়ে আছে কামিনি গাছের পাশে। 'কী খবর রে, মারা গেছে নাকি তোদের ডিপার্টমেন্টের ছাত্র।'

'না, আমার ডিপার্টমেন্টের নয়। পাশের, ইতিহাসের, কালকে পল্টনে জানাজা।'

কামালের কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। উপরে উঠে হাতমুখ ধুয়ে খাবার টেবিলে বসলো। মাও জানতে চাচ্ছেন কী হয়েছে। সবার মুখে মুখে ছড়িয়ে গেছে ইউনিভার্সিটির ছাত্র মারা গেছে। খাবার নাড়াচাড়া করে উঠে পড়লো কামাল। কিছুক্ষণ শুয়ে রইলো। তিনটার দিকে বেরুলো। গেটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে দোলা।

'কই যাচ্ছিস।'

'শোক মিছিলে।'

'আমিও যাবো।'

'তুই যাবি, পাগল হলি নাকি।'

'না আমি যাবো।'

'চাচা-চাচি যেতে দেবে তোকে ?'

'তাদের বলবো না।'

'তাদের পারমিশন ছাড়া আমি তোকে নেব এমন কথা মনে হলো কেন তোর।'

'আমি যাবো।' কামালের হাত ধরলো দোলা, 'না নিলে চিৎকার করে কাঁদবো।'

'ভারি ফ্যাসাদ তো।' কামাল নার্ভাস হয়ে বললো। একে বিশ্বাস নেই। কখন কী করে। পেছন দিকে দেখলো বারান্দায় কেউ নেই। 'আয় তাড়াতাড়ি।' গেট খুলে দু'জনে বেরিয়ে এলো। অনেক কষ্টে একটা রিকশা

পেলো। শাহবাগ পর্যন্ত যাবে। তাই সই। রাস্তায় তেমন লোকজন নেই। শাহবাগে নামলো। এখানে দেখা গেলো ছাত্রছাত্রীরা সব এগুচ্ছে টিএসসির দিকে। দোলা বললো, 'তুই তো আমাকে আনতে চাসনি, দেখতো কত মেয়েরা এসেছে।' কামাল জবাব দিলো না। হাঁটতে হাঁটতে দুজনে এলো টিএসসির মোড়ে। এখানে সেখানে জটলা। কী হবে এখনও ঠিক হয়নি। রোদ পড়তেই কোত্থেকে এগিয়ে এলেন দীপাদি। বললেন, 'মিছিল বের হবে, রেডি হও।' দীপাদির পেছনে সবাই দাঁড়াতে লাগলো। কামাল দোলাকে নিয়ে লাইনে দাঁড়ালো। বাংলা একাডেমীর সামনে লাইন করে দাঁড়িয়ে পুলিশ। একটি ছেলে দীপাদির হাতে কালো পতাকা তুলে দিলো। দীপাদি চলা শুরু করলেন। এক লাইনে সবাই এগুতে লাগলো। কামাল লাইন থেকে বেরিয়ে একবার পিছনে দেখার চেষ্টা করলো। বিশাল মিছিল। শেষটা দেখা যায় না, এতো ছেলেমেয়ে এল কোত্থেকে। লাইন এগুচ্ছে। পুলিশের সামনে এসে লাইন থেমে গেলো। কোনও স্লোগান নেই। সবাই নিঃশব্দ। পুলিশ কী লাঠিচার্জ করবে। পেছন থেকে দোলা কামালের একটা হাত চেপে ধরলো। কামাল পিছে ফিরে বললো, 'ঘাবড়াসনে আমরা এতজন আছি না?' বললো বটে, সেও নার্ভাস। যদি লাঠিচার্জ করে, কে কোথায় ছিটকে পড়বে। দোলার কিছু হলে কী জবাব দেবে। দীপাদি একহাত দিয়ে পুলিশের লাঠিটা সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেলেন পতাকা হাতে। দ্রুত এগুতে লাগলো সবাই। পুলিশরা বাধা দিলো না। মিছিল এগুতে লাগলো কার্জন হলের দিকে। রাস্তার দুপাশে এখন লোক দাঁড়িয়ে গেছে। কারও মুখে কোনও স্লোগান নেই। কার্জন হল ঘুরে মিছিল ফিরলো মেডিকেলের দিকে। শহীদ মিনারে শেষ হবে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সবাই দীপাদির পিছে হাঁটছে।

সন্ধ্যা নামছে। রাস্তায়, অন্তত বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এখানে সেখানে জটলা। কামাল বললো, 'দোলা আমার এখনই ফিরতে ইচ্ছে করছে না। আমি আজ শহরটা আরেকটু ঘুরে দেখতে চাই। তোকে রিকশায় তুলে দি, নইলে সবাই ভাববে।'

'না, আমিও আজ রাস্তায় থাকতে চাই। একদিন না হয় সবাই ভাবলোই।'

'তা' হয় না, আমার সঙ্গে এসেছিস, একটা দায়িত্ব আছে না। ঠিক আছে, ইকবাল হল পর্যন্ত চল, হাঁটতে পারবি তো।'

ইকবাল হলের দিকে হাঁটতে থাকে ওরা। পথে জাহিদের সঙ্গে দেখা। সেও যোগ দেয়। ইকবাল হলে ছাত্র ছাড়াও নানা ধরনের মানুষের ভিড়।

সবাই খবরাখবর জানতে চায়। ছাত্রনেতারা কী ভাবছে জানতে চায়। সেখানে শুনলো আসাদ হত্যার প্রতিবাদে তিন দিনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ২১ জানুয়ারি হরতাল আর গায়েবানা জানাজা, ২২ জানুয়ারি শোক মিছিল আর ২৩ জানুয়ারি সন্ধ্যায় মশাল মিছিল। আবার হেঁটে হেঁটে এলো তারা ঢাকা হলে। আসাদ এই হলের ছাত্র ছিলেন। সেখানেও জটলা। দু'জন ছাত্র নিজ মনে আবৃত্তি করছে—

"মৃত্যুর জানাজা মোরা কিছুতেই করিব না পাঠ
কবরের ঘুম ভাঙ্গে জীবনের দাবি আজ এতই বিরাট।"

হলের সামনে রাস্তায় সাধারণ মানুষের ভিড়। নানাজনের নানা মন্তব্য।

'একটু পত্রিকা অফিস হয়ে যাই,' বললো কামাল, 'হাঁটতে পারবি না রিকশা নেব।'

'না আর হাঁটতে পারবো না, রিকশা নাও। ভাড়ার জন্য চিন্তা করো না।' বললো দোলা।

চানখাঁর পুলের কাছে একটা রিকশা পাওয়া গেলো। পুরনো ঢাকায়ও একই দৃশ্য। মুদি দোকানের সামনে, চায়ের দোকানের সামনে, মসজিদের সামনে মানুষের জটলা। 'একদিনে মানুষজন সব বদলে গেলো,' আস্তে আস্তে বলে দোলা।

'না, একদিনে নয়,' উত্তর দেয় কামাল, 'সময় লেগেছে। জানি না, '৫২ সালেও বোধহয় শহরটা এমন হয়ে গিয়েছিলো।'

আজাদ অফিসের সামনে এসে দোলা বলে, 'আমি বসি, তুই ঘুরে আয়, এই রিকশায় ফিরে যাবো।'

'রিকশা যাবে নাকি পল্টন ?' জিজ্ঞেস করে কামাল। ঘাড় নেড়ে সায় দেয় রিকশাঅলা। ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আজ সবার মমতা।

'তা'হলে নাম,' দোলাকে নিয়ে কামাল ভেতরে ঢোকে। দু'একজন রিপোর্টার তাকে ঘিরে ধরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা জিজ্ঞেস করে। নিউজ এডিটর কামালকে দেখে ডাকেন। সামনের চেয়ারে দু'জনকে বসতে বলেন, ধরে নিয়েছেন দোলা কামালের সহপাঠী। দু' কাপ চা দিতে বলে কামালকে বললেন, 'এসে ভালোই করেছ। নয়ত খবর পাঠাতে হতো। একজনের জ্বর, আরেকজন বাড়ি গেছে, রিপোর্টার শর্ট। তুমি এক কাজ করো, কালকে শহরের এদিক সেদিক ঘোর। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলো। পল্টন থেকে ফিরে একটা রিপোর্ট লেখো। তেমন রিপোর্ট হলে তোমার নামে যাবে।'

তিনি আবার তার কাজে মন দেন। কামাল দোলাকে নিয়ে ওঠে। রিকশাঅলাকে বলে, 'ভাই, একটু কষ্ট হলো।'

'কিসের কষ্ট হলো।'

'কিসের কষ্ট, এমনিতেই তো না খাইয়া থাহি, এইডার কষ্ট কী ঐডার থিয়া বেশি। আপনারা বাইচ্যা থাহেন, দেশের কামে লাগবো। আমরা বাইচ্যা না থাকলেও চলবো।'

মানুষের মুখের ভাষাও বদলে গেছে। মনের মধ্যে আবেগ উথলে ওঠে। সে হঠাৎ দোলার একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে বলে, 'বুঝছিস, এমন একটা রিপোর্ট লিখতে হবে যাতে শহরটা বোঝা যায় সে কথা শেষ করতে পারে না। এতদিন সে রিপোর্ট লিখেছে। 'বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টারে'র নামে গেছে। এখন যদি নিজের নামে যায় সেটা অন্য ব্যাপার হবে। বাসার সামনে এসে দু'জনে নামে। দোলা ব্যাগ খুলে রিকশাঅলাকে একটা পাঁচ টাকার নোট দেয়। রিকশাঅলা বলে, 'ভাংতি নেই।'

'ভাংতি লাগবো না। রেখে দেন।'

বাসার গেটটা খোলা। রাস্তায় লাইটের আলোয় দেখে বাবা-মারা দাঁড়িয়ে আছেন, আশপাশে বাসার দু'একজন পুরুষ মহিলাও দাঁড়িয়ে। চাপা উদ্বেগ, নিচু স্বরে কথা বলছেন। দোলাকে দেখে হক চাচি এগিয়ে আসেন, জড়িয়ে ধরেন তাকে 'কই ছিলি, বলে যাবি না,' ব্যস আর কিছু বলেন না। রহিম সাহেব, হক সাহেব ও অন্যান্যরা কামালকে ঘিরে ধরেন। নতুন কোনও খবর আছে কি না জানার জন্য। কামাল সারাদিনের ঘটনা বলা শেষ করে।

'না, এবার আর পার পাবে না মোনেম খান,' বলেন একজন, 'এ তো ৫২ সালের মতো, ছাত্র মেরে ফেলে গুলি করে,' বললেন আরেকজন।

'ছাত্ররা শান্ত না হলে আর শান্তি আসবে না,' বলেন তৃতীয় জন।

'যা হাত মুখ ধুয়ে বিশ্রাম নে,' বললেন রহিম সাহেব।

কামাল ভেতরে ঢুকলো। তারা গল্প করতে লাগলেন।

৩

সকাল সকালই কামাল বেরিয়ে গেলো। প্রথমে ঠিক করলো যাবে নারিন্দা, ওয়ারী, সেখান থেকে নওয়াবপুর হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়। মানুষজনের মনের অবস্থা বোঝার চেষ্টা করবে। বিকেলে পল্টন। আম্মার কাছে থেকে বলেকয়ে

দশটা টাকা নিয়েছে। 'না, এবার আব্বাকে বলতেই হবে একটা সাইকেলের জন্য'। ভাবে কামাল। লোকজনের ভিড় এখনও কমেনি। ছাত্ররা হরতাল ঘোষণা করছে বটে কিন্তু কতটা তা সফল হবে তা নিয়ে সন্দেহ ছিলো কামালের। কিন্তু দেখা গেলো ছাত্রদের কথা রেখেছে মানুষজন। বাস বন্ধ, ইপিআরটিসির বাসও নামেনি। গাড়ি ঘোড়া তো নেই-ই। মাঝে মাঝে সাইকেলে করে দু'একজন যাচ্ছে। দু'একটা রিকশাও এদিক-ওদিক দেখে যাত্রী নিয়ে যাচ্ছে।

গুলিস্তানের মোড়ে একটা রিকশা পেলো কামাল। রিকশাঅলা যাবে না অত দূরে, চুপেচাপে দু'একটা খ্যাপ দিতে পারে। কামাল বললো, 'আমি সাংবাদিক, কেউ তোমাকে কিছু বলবে না চলো।'

নওয়াবপুর হয়ে ঠাঁটারিবাজারের ভেতর দিয়ে ওয়ারী পৌঁছবে বলে ঠিক করেছিলো কামাল। ঠাঁটারিবাজারের কাছে আসতেই একদল ছেলে ছোকড়া তার রিকশা ঘিরে ধরলো। রিকশাঅলা ভয়ে প্রায় আধা মরা। একজন মারমুখো হয়ে বললো, 'জানেন না আজ হরতাল।'

'জানি, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আর সাংবাদিক, শহরের অবস্থা নিয়ে আমাকে লিখতে হবে। আপনারা বরং আমাকে সাহায্য করুন।' রিকশা থেকে নামলো কামাল। 'রিকশা ভাই, কোনও ভয় নাই,' লিডার গোছের ছেলেটা বললো, 'আপনি ইন্টারভিউ নিবেন।' হরতাল হলেও আনাচে কানাচে দু'একজন তরকারিঅলা বসেছে। দু'একটা মুদি দোকানের ঝাঁপি খুলেছে। কামালের ছাত্র পরিচয় পেয়ে সবাই খুশি মনে মতামত দিতে লাগলো। এরপর আর ঘুরে বেড়াতে কষ্ট হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে না গিয়ে বায়তুল মোকাররমে রিকশা ছেড়ে বাসায় ফিরেছে।

দুপুরে খেয়েদেয়ে বেরুবে, কী ভেবে দোলাদের দরজার কড়া নাড়লো। দরজা খুলে দিলেন দোলার মা।

'দোলা যাবে নাকি আমার সঙ্গে জিজ্ঞেস করেন তো চাচি,' বললো কামাল। তার গলার স্বর শুনে দোলা বেরিয়ে এসেছে, 'এক মিনিট' বলে সে আবার ঘরে ঢুকলো। বেরিয়ে এসে বললো 'চল'।

'বাবা-মারা বোধহয় এখন আর ছেলেমেয়েদের বাধা দিচ্ছেন না,' বলে দোলা।

'না, দিলেও কেউ মানছে না।'

'তা, কী মনে করে আমাকে ডাকলি,' জিজ্ঞেস করে দোলা, 'কখনও তো নিজে থেকে ডাকিস নি'। নাকি আমাকে পয়া ভাবছিস। কালকে

দেখলিতো, আমি গেলাম আর তুই আসল রিপোর্টার হিসেবে প্রমোশন পেলি।'

'কী জানি, ইচ্ছে হলো,' দার্শনিকের মতো জবাব দেয় কামাল।

সদর রাস্তায় পৌঁছে অবাক হয়। এ কী কান্ড, চারদিক থেকে মানুষ পল্টনের দিকে ছুটছে। বায়তুল মোকাররমের কাছে এসে দেখে কবি শামসুর রাহমান বিষণ্ন মনে পল্টনের দিকে এগোচ্ছেন, সঙ্গে আরেকজন, তাকে চেনে না কামাল। বিষণ্ন মনে তিনি হাঁটছেন। কামাল সালাম দিলো। সালাম নিলেন তিনি, মৃদু হাসলেন। বললেন, 'এখন তোমাদেরই সময়।'

'এ দোলা, রাহমান ভাই, আমার পাশের বাসায় থাকে।' বললো কামাল। সবাই হাঁটতে লাগলো। কামালের আফসোস হলো, 'বুঝলি মিলি যদি থাকতো, শামসুর রাহমানের সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিলো।'

'মিলিটা আবার কে ?' অবাক হয়ে দোলা জিজ্ঞেস করে।

'তুই চিনবি না, আমার সঙ্গে পড়ে।'

'অ।'

স্টেডিয়ামের গেট পেরিয়ে আর তারা এগুতে পারলো না। ভিড়ে ভিড়ে পল্টন একাকার। কে যেন বললো, শিবপুরের হাতিরদিয়া থেকে কৃষকরা এসেছে। আসাদ হাতিরদিয়ার মানুষ, কৃষক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বেশ দূরে উঁচু স্টেজ। বাঁশের ডগায় পতপত করে উড়ছে একটি শার্ট।

'এটা আবার কী ?' দোলা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

'আসাদের রক্তমাখা শার্ট।' পাশ থেকে একজন উত্তর দেয়।

'এখন ১৪৪ ধারা গেলো কই।' মন্তব্য করে একজন।

'ঠোলারা গেলো কই ?' আরেকজন জিজ্ঞেস করে।

এরি মধ্যে কয়েকজনের বক্তৃতা হয়ে গেছে।

এরপর তোফায়েল আহমেদ উঠলেন। এতদূরে কথা ভালো বোঝা যাচ্ছে না, স্বরটা উত্তেজিত। বক্তৃতা শেষে গায়েবানা জানাজা। এরপর মিছিল। পতাকার মতো আসাদের শার্ট নিয়ে মিছিল শুরু হয়। পেছন থেকে মনে হয় সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ওঠানামা করছে। কামাল বললো, 'আমি মিছিলের সঙ্গে কিছুটা গিয়ে অফিসে যাব। আমাকে লিখতে হবে। তুই যেতে পারবি না ফিরে।'

ঘাড় নাড়লো দোলা। সে অভিভূত। এতো লোক কখনও দেখেনি একসঙ্গে। তার নিজের মধ্যে এক ধরনের শক্তি অনুভব করছে সে। মানুষ বোধ হয় মানুষের শক্তি বাড়ায়।

'কাল আমার রিপোর্টটা পড়িস। সব সময় তো আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করলি। দেখিস কালকের রিপোর্টটা।' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে কামাল। তারপর মিছিলের সঙ্গে এগিয়ে যায়।

নিউজ এডিটর খুব খুশি। 'যাক তুমি এসেছ।' বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপোর্টারদের ঠিক নেই। তাদের দোষও নেই। টাকা পয়সাও তো সব সময় দেওয়া হয় না। তার তো কাগজ ভরতে হবে। খুবই কম্পিটিশনের ব্যাপার। 'এই আবদুল ? স্যারকে এক কাপ চা দে।' হাঁক দিলেন নিউজ এডিটর।

নিউজপ্রিন্ট প্যাডটা টেনে নিয়ে কামাল লিখতে বসলো। একটানা স্লিপের পর স্লিপ লিখলো। একঘণ্টা পর সব জমা করে নিউজ এডিটরের সামনে দাঁড়ালো। কপি দেখে তিনি আঁতকে উঠলেন। 'এতো বড়!'

'বড় ঘটনার রিপোর্ট তো বড় হবেই। আপনি কেটেছেটে ঠিক করে দেন।' বড় হওয়ার অজুহাতে যদি না ছাপেন, ভাবে কামাল।

'ঠিক আছে তুমি বসো। একেকটা গ্যালি আসুক, প্রুফ দেখে দাও।'

ঘণ্টা দুয়েক আরও লাগলো সব ঠিক করতে। কামাল যখন বাসায় ফিরলো তখন গভীর রাত। রাস্তা সুনসান।

দোলা খুব সকালে উঠে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। হকার এলেই এক কপি আজাদ কিনবে। 'যেদিন দরকার যেদিন ব্যাটার দেখা নেই,' বিড়বিড় করে দোলা। সকাল আটটার দিকে হকার আসে। এক কপি কাগজ কিনে নিজের ঘরে চলে আসে। প্রথম পৃষ্ঠায়ই কামালউদ্দিন রহিমের রিপোর্ট। আস্তে আস্তে সে পড়তে থাকে। যতই এগুতে থাকে ততই মনে হয় সারা শহরটা সে ঘুরছে তার সামনেই ঘটনাগুলো ঘটছে। এদিকে মা ডাকছেন নাস্তা করতে। বাবা অফিসে চলে গেছেন। নাস্তা করেই কাগজটা হাতে নিয়ে, 'আমি আসছি ওপরতলা থেকে,' বলে লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙতে থাকে। রহিম সাহেব অফিসে যাওয়ার জন্য নিচে নামছেন। বললো, 'কিরে ডাকাত পড়েছে নাকি, ছুটছিস কেন ?' দরজা খোলাই ছিলো।

'চাচি,' কামালের মা খাওয়ার টেবিলেই বসে ছিলেন। 'তোমার ছেলে কই।'

'কেন রে।'

'আরে তার একটা রিপোর্ট বেরিয়েছে, মার্ভেলাস। তুমি তো বাইরে যাওনি। এটি পড়লেই বুঝবে ঢাকা শহরে কী হচ্ছে।'

'আরে চেঁচাস না, ছেলেটা অনেক রাতে এসেছে। এখনও ঘুমাচ্ছে। তুই চা খা এক কাপ।'

'দাও। আর বসো তুমি, আমি পড়ছি শোন, তুমি তো জান না, তোমার ছেলে তো লেখক হয়ে গেলো।'

'তাই নাকি,' চা ঢেলে দিলেন দোলাকে। নিজেও এককাপ নিলেন। নিজের মেয়েই মনে হয় মাঝে মাঝে দোলাকে। বললেন, 'পড় শুনি, আমার ছেলের কোনও প্রশংসা তো তোর মুখে আগে শুনি নি।'

'আহ্ হা চাচি, প্রশংসার কাজ করলে তো শুনবে। বস আমি পড়ছি দোলা পড়া শুরু করে—

**"মৃত্যুর জানাজা মোরা কিছুতেই করিব না পাঠ,
কবরের ঘুম ভাঙ্গে জীবনের দাবি আজ এতই বিরাট"**

"শহীদ আসাদের মৃত্যুর খবর দাবানলের মতো সমগ্র শহরে ছড়িয়ে পড়ার পর সোমবার সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা হলের সামনে একদল ছাত্রের গুঞ্জরণ থেকে ওপরের ওই শব্দগুলো আমার কানে নয়, বুকে এসে বাজলো। ছেলেটি আবৃত্তি করছিলো না, যেন চোখ-মুখ-কণ্ঠ এক করে অন্ত রের অন্তস্থল থেকে উচ্চারণ করছিলো। বাকি যে কজন শুনছে তাদের চোখেও যেন আগুন জ্বলছে। কাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি শোকাহত থমথমে ভাব দেখিনি, দেখেছি সাথীর মৃত্যুতে সমগ্র ছাত্র সমাজের গত এক দশকের সঞ্চিত বিক্ষোভ যেন ফেটে পড়েছে। জালেমের জিঞ্জির ভাঙবার শপথে তারা অটল।"

'একজন ছাত্র আমায় বললো—"আসাদ মরেছে কিন্তু আমরা মরিনি। দেখবো ওদের কত বুলেট আছে। সংগ্রাম আমাদের চলবেই।"

"আমি প্রতিটি হলে ঘুরে দেখেছি মুক্তিপাগল ছাত্ররা সাথীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ক্ষমাহীন দুর্বাশার মতোই অটল। সাথীহারার বেদনায় তাদের কাতরাতে দেখিনি। রোকেয়া হলের বিএ (অনার্স) ক্লাসের একজন ছাত্রী বলেছে, কেঁদে কি হবে, আসাদের আরব্ধ কাজ আমাদের শেষ করতে হবে। আসাদ যে পৃথিবী গড়ার স্বপ্নে প্রাণ দিয়েছে, সে পৃথিবী আমরা গড়বো। আমরা কাঁদবো না, আমরা কাঁদবো না।" সে বলছিলো আমরা কাঁদবো না, কিন্তু তার চোখ থেকে আমি টপটপ করে পানি পড়তে দেখেছি। আর তার সাথীরা চোখে-মুখে আঁচল চেপে রীতিমতো হু হু করে কাঁদছিলো। ওরা তখন মঙ্গলবারের কর্মসূচি তৈরির কাজে ব্যস্ত।

"সোমবার বিকেলে ছেলে-মেয়েদের যে মিছিলটি বের হয়েছিলো, সেখানে আমি দেখেছি সবার কণ্ঠে কান্না জমে আছে। অথচ সবাই বুলন্দ কণ্ঠে সংগ্রামের ডাক দিচ্ছে। কলেজের এক শিক্ষক পাশ দিয়ে হেঁটে

যাচ্ছিলেন। তিনি ওদের আওয়াজ শুনতে শুনতে কেঁদে ফেলেছিলেন। রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বিড়বিড় করে বললেন—ওদের কাঁদতে বলো, ওদের কাঁদতে বলো, ওদের বুকে বহু কান্না জমেছে। কান্না চাপা এই ডাক সহ্য হবে না। খোদার আরশ ফেটে যাবে।"

"সোমবার দুপুরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ আউট ডোরে এক থুর থুরে বুড়ির সাথে আমার দেখা হয়েছিলো। উনি মিরপুর থেকে এসেছিলেন ছোট নাতিটিকে সাথে করে হাসপাতাল থেকে ওষুধ নিতে। তখন হাসপাতালে মর্মান্তিক দৃশ্য। বুড়ি কিছু বোঝে না কিন্তু তাকেও আমি বলতে শুনেছি—ইয়ে কেয়া বাত হায় বাবু। ছোট ছোট বাত মে গোলি চালানা, ইয়ে কাহাকা দাস্তুর হায়। ইনসান ইনসান কো ইসতারাহ খুন করতা হায়, ইয়ে ক্যায়সা কানুন হ্যায়। মানুষ মানুষকে এমনিভাবে খুন করে, এ কোথাকার কানুন—৭০ বছরের বুড়ি এর অর্থ খুঁজে পায় না।"

"যেমন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সামনের ফলওয়ালা রহিমুল্লাহ বুঝতে পারে না। তার প্রশ্ন "হে তো কিছুই করবার চাইছিলো না। নিজেরে বাঁচাবার চাইছিলো। হেরে খুন করল ক্যান ?"

"মঙ্গলবার গোটা শহরের আনাচে কানাচে আমি অবাধ্যতার ঢেউ দেখেছি। শুধু বিক্ষোভ আর বিক্ষোভ। সবাই শোকাতুর। কিন্তু কারও চোখে আমি হতাশা দেখিনি। ১৩ বছরের তরুণ আমিনউদ্দিন বলুন আর অশীতিপর বৃদ্ধ কছির মিয়াই বলুন। সবার চোখেই দেখেছি সেই বজ্র শপথ, যাতে অনায়াসে স্ফুলিঙ্গের সাথে আলিঙ্গন করা যায়। আমিনউদ্দিনের দলটিতে ১২/১৩ জন কিশোর ছিলো। পুলিশের গাড়ির পেছনে পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করতে দেখেছি। তাদের মুখে এক কথা—জ্বালাইয়া ফেলাও হালায়। হগগল জ্বালাইয়া ফেলাও।"

"কছির মিঞা ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছিলেন হেঁটে হেঁটে, আশি বছরের বুড়ো হেঁটে যাচ্ছিলেন। ভেবেছিলাম তিনি বুঝিবা বিরক্ত হয়ে কিছু বলবেন। কিন্তু দেখলাম নিজের বিপদকে তিনি সব কিছুর ওপরে তুলে ধরেননি। তিনি বললেন, "আইজ হাঁটতে আমার কষ্ট হয়নি। ওরা এক যাদুকে মেরে ফেলেছে। ওর বাবা-মায়ের দুঃখের কাছে আমার কষ্ট কিছুই না"। তার চোখে মুখে আমি দেখেছি গভীর প্রত্যাশা। তিনি বলেন—"যারা জান দিচ্ছে, তারা জিতবেই, জয় তাদের হবেই"। বুড়ো এতো জোর দিয়ে বললেন, শুনে আমার মনে হলো, মরার আগেই নব প্রভাতে সোনালি মুখ তিনি দেখে যেতে চান।'

"দেখে মনে হলো, সরকারি নির্যাতন আর বেত, বুলেট বেয়নেট সমগ্র জনতাকে আজ প্রতিবাদ মুখর আর বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। মুক্তি পিয়াসী মানুষ আজ আন্দোলনে নামতে কিছু দ্বিধা করছেন না। প্রিয় নওয়াবগঞ্জ এলাকার এক পানওয়ালা বলেছেন, শুধু ছাত্র-ছুত্র দিয়া আন্দোলন অইত না। ইবার হক্কলের এক হওন লাইগ' ব।'

সাধারণ মেহনতী মানুষ আজ ক্ষুব্ধ। আমি সোম ও মঙ্গলবার তাদের মুখে যেসব কথা শুনেছি, সে উক্তিগুলো তুলে ধরছি—

বেগম বাজার এলাকার এক চায়ের দোকানদার নিজের দোকান বন্ধ করে আজ সবাইকে ধর্মঘট করার আবেদন জানাচ্ছিলো। আমায় দেখে সে বললো—"ছাত্রদের এতো খুন খাইয়াও পুলিশের তিরপ্তি অইল না। কিন্তু ওরা কটা মাইরব। দ্যাশে কোটি কোটি ছাত্র-মানুষ আছে। আমরা বেবাক একজুট অই রুইখ্যা দাঁড়াইলে হালারা কুত্তার মত ভাইগ্যা যাইবো"।

মৌলবীবাজারে দেখা হয়েছিলো হামিদ মুন্সির সাথে। বয়স ৬০ বছরের মতো। আছরের নামাজ পড়ে বের হয়েছিলেন মসজিদ থেকে। তিনি বললেন, "আমরা ট্যাক্সের পয়সা যোগাই। সেই পয়সা দিয়া বুলেট কিইন্যা আমাদের পুলাদের বুকেই মারে। আমরা কিরা কাটতাছি, এইবার থাইক্যা খাজনা—ট্যাক্স বন্দ কইরা দিমু। দেখমু কোন পইসা দিয়া আমাদের পোলাদের গুলি মারে। বলতে বলতে তার উদগত কান্না থামানোর জন্য তিনি চোখে হাত দিলেন।"

র‍্যাংকিন স্ট্রিটের একজন মুদির দোকানদার বলেন—"একদিনের হরতালে হইব না। হাজার দিন হরতাল করমু। আহেন দোকানপাট বন্দ কইরা রাস্তায় নামি"।

রিকশাওয়ালা ছালাম বলেন—

"কি হইব হালায় রিকশা চালাইয়া। এমনিতো পোলাপান না খাইয়া থাকে। হক্কল দিন যাতে পোলাপানের মুখে খাওয়া দিতে পারি—এর লাইগা দশ দিন হরতাল কইরা না খাইয়া থাকুম"। এই ধরনের উক্তি করেছেন হাজারীবাগের এক ট্যানারি শ্রমিক। তার উক্তি ঝাঁপাইয়া পড়বো। যা হওয়ার তা হবে। আমাদের আর কি হবে ? এমনিতেই বউ-ছওয়ালদের খাইতে দিতে পারি না, অনাহারে, অর্দ্ধাহারে থাকি। আমাদের আছে কি যে হারাবে। আমাদের ঝাঁপাইয়া পড়তে আপত্তি নাই। আর আমরা ঝাঁপাইয়া পড়লে উপায় থাকবে না।

এমন ধরনের অগণিত কথা শুনেছি গত সোমবার ও মঙ্গলবার। চারদিকে বিক্ষোভ আর উত্তাপ। বেদন আর রোদন মুছে গেছে, চোখে অশ্রুকণা নেই, সেখানে যে অগ্নিকণার স্ফুলিঙ্গ। আমাদের মৃত্যু জীবনের মুক্তিপথের দিশা দিয়ে গেছে—সে পথে চলার গান শুরু হয়েছে। সবার কণ্ঠে এক ধ্বনি, "আমরা বাঁচার মত বাঁচতে চাই"।

ঔ

পড়া শেষ করলো দোলা।

'কী চাচি কথা বলছো না যে।'

কামালের আম্মার মুখে স্মিত হাসি। কতটুকু ছিলো কামাল, আজ কত বড় হয়ে গেলো। চোখের সামনে, টেরই পেলেন না তিনি। তার এতটুকু ছেলে লেখক। কামালউদ্দিন রহিম, কতজন আজ তার নাম জানবে। উথাল-পাথাল করে উঠলো বুকটা। বললেন, 'দেখ, লেখক সাহেবের ঘুম ভাঙল কি না ?'

কাগজটা হাতে নিয়ে কামালের ঘরে ঢুকলো দোলা। নিঃসারে ঘুমাচ্ছে। 'এই যে লেখক সাহেব' বলে ডাকলো একবার। ভাবলো, চুলের মুঠিটা ধরে একবার ঝাঁকাবে কি না। না, চমকে উঠতে পারে। বরং আস্তে আস্তে চুলে বিলি কাটতে কাটতে কৌতুকের সুরে বললো দোলা, 'এই যে লেখক সাহেব উঠেন উঠেন।'

চোখ মেললো কামাল। খপ করে হাত ধরলো দোলার। ঝুঁকে পড়ল দোলা। 'তোর যন্ত্রণায় তো বাসায়ই টেকা যাবে না।'

'হাত ছাড়', লাজুক ভঙ্গিতে বললো দোলা, 'ফর্মালিই বলি। কামালউদ্দিন রহিম সাহেব আপনি অনবদ্য একটি লেখা লিখেছেন। অভিনন্দন।'

উঠে বসলো কামাল, 'একি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে।' হেসে বললো সে।

'আজ আর বেরুবি না।'

'না,' আড়মোড়া ভাঙলো কামাল। 'বেরুলে বিকেলে বেরুবো।'

'ঠিক আছে, বিশ্রাম নে।' বলে কাগজটা বিছানার ওপর ফেলে রুম থেকে বেরিয়ে গেলো দোলা।

রহিম কাগজটা টেনে নিজের রিপোর্টটা পড়া শেষ করলো। একটানা লিখে গেছে, কী লিখেছে নিজেও জানে না। পড়ে মনে হলো, মন্দ না। সে লিখতে পারবে। যদি সুযোগ পায় যে দিন যাচ্ছে আর আসবে না ফিরে, সে দিনের কথা লিখে যাবে। একদিন হয়ত তা ইতিহাসের অংশ হয়ে যাবে। খুশি হয়ে উঠলো মনটা। ধীরেসুস্থে গোসল করে নাস্তা খেয়ে চায়ের কাপ নিয়ে যখন বসলো তখন ১১টারও বেশি বাজে। ভাবলো একবার যাবে নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ে। না, বিক্ষোভ মিছিল যা শুরু হওয়ার শুরু হয়ে গেছে।

এমন সময় সিঁড়ির গোড়ায় হইচই। কলিং বেলের শব্দ। দেখলো, কাদের, জাহিদ, অনিল একসঙ্গে তিনজনে বলে উঠলো, 'কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই।'

' যা লিখেছিস', বললো জাহিদ, 'মার মার কাট কাট।'

'আরে, হলে দেখলাম, অনেকে তোর রিপোর্ট পড়ছে।'

'তাই দেখে সব বাদ দিয়ে চলে এলাম এখানে।'

কামালের মা হইচই শুনে পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। কাদের বললো, 'চাচি আজ ভালো করে খাওয়ান। আমাদের বন্ধু আজ আমাদের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়েছে।'

'পাগল সব, খেয়ে যেয়ো দুপুরে। আমি এখনই রান্না বসাচ্ছি।'

কামালের ঘরে বসলো সবাই। গত দু'সপ্তাহের টানা টেনশনের পর হালকা লাগছে।

'আজ কী হলো ?' জিজ্ঞেস করে কামাল।

'ছোট ছোট মিছিল বেরুচ্ছে,' বললো কাদের, 'পুলিশ তেমন একটা বাধা দিচ্ছে না। দেখা যাক কী হয় ?

'আন্দোলন কী থেমে যাবে ?' জিজ্ঞেস করে জাহিদ।

'আমার মনে হয় না,' বলে অনিল, 'এখন ফেরার পথ নেই। আন্দোলন এখন ঝিমিয়ে পড়লে চাঙ্গা করতে আরও সময় লাগবে।'

'মানুষের আশা বাড়ছে,' বললো কামাল, 'মানুষ চায় একটা কিছু হোক।'

'দেখ, ব্যানার, ফেস্টুন, স্লোগানের ভাষা বদলে যাচ্ছে,' বলে কাদের, 'রবীন্দ্রনাথও ফিরে আসছেন। আজ এক ব্যানারে দেখলাম লেখা আছে—

'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
ভয় নাই ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই ওরে ক্ষয় নাই।'

‘একটা ব্যানারে দেখলাম,’ বললো জাহিদ, ‘লেখা আছে, রক্তের ডাকে সাড়া দাও।’

‘পত্রিকায় দেখলাম, সারাদেশে মিছিল হচ্ছে, বিক্ষোভ হচ্ছে। বিডি মেম্বাররা অনেক জায়গায় পালিয়েছে, নয়ত মিছিলে যোগ দিচ্ছে,’ বললো অনিল, ‘সরকার হয়ত আরও কঠোর হবে, কিন্তু সেটা হবে মরিয়া মানুষের শেষ চেষ্টা।’

‘আমাদের পড়ালেখার কী হবে?’ জিজ্ঞেস করে কামাল।

‘কয়েকদিন না হয় বন্ধ থাকবে তারপর হবে বা এর মাঝে-মাঝেই হবে। ভিয়েতনামে যুদ্ধ চলছে কত বছর, পড়ালেখা কি থেমে আছে?’

দুপুরে খুব হইচই করে খেলো সবাই। অনিল বললো, ‘মাসিমা, হোস্টেলে খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেছে। মাঝে-মাঝে এ রকম ফিস্টি দিয়েন।’

‘যে কোনো সময় এসে টেবিলে বসে খেয়ো’, হেসে বললেন কামালের আম্মা। ‘তোমরা কি আমার পর।’

খেয়ে-দেয়ে বিদায় নিলো ওরা। যাবার আগে কাদের বললো, ‘যাই কালকের মশাল মিছিলটা সাকসেসফুল করতে হবে।’

কামাল কিছুক্ষণ গড়িয়ে নিলো, বিকেলে গেলো আজাদ অফিসে। আজ যেন সবাই তার জন্যই অপেক্ষা করছিলো। অভিনন্দন জানিয়ে হাত মেলালো অনেকে। নিউজ এডিটর কামালের কাঁধ চাপড়ে বললেন, ‘মান রেখেছো আমার। আগামীকাল মশাল মিছিলটা কভার করো।’

আরও কিছুক্ষণ বসে চা খেয়ে গল্পগুজব করে কামাল পল্টনের পথ ধরলো।

পরদিন সকালে সে বেরুচ্ছে। দোলা দেখে বললো, ‘আমাকে একটু এগিয়ে দে, বিকেলে কিন্তু আমাকে নিয়ে যাস।’

কামাল ভেবেছিলো হেঁটেই যাবে। ভার্সিটি পর্যন্ত রিকশা নিলো। দুজনেই নামলো।

কামাল বললো, ‘ওইটুকু হেঁটে যা। বিকেলে রেডি থাকিস।’

আজও ভিড় কলাভবনে। আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ে কলাভবনটাই যেন কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। তার লেখক বন্ধুদের কাউকে পেল না। অন্যান্য কয়েকজনকে পেলো। মধুর ক্যান্টিনে চা খেয়ে সবাই বিদায় নিলো। সবার একমাত্র লক্ষ্য মশাল মিছিল সফল করা।

দোলার হাতে মশাল। শক্ত হাতে ধরে রেখেছে। মশালের আলোছায়া তার শরীরে।

বিকেলে দোলাকে নিয়ে বেরুলো কামাল। এবং চাচিকে বলেই। কামাল লক্ষ্য করে দেখলো, একটু পরিপাটি লাগছে দোলাকে। কপালে টিপও আছে একটি। রিকশা নিয়ে রোকেয়া হল অব্দি যেতে পারলো। নেমে পড়লো দুজনে। ছোট ছোট মিছিল এগুচ্ছে কলাভবনের দিকে। মেয়েদের একটি মিছিল গেলো। কামাল খুঁজলো মিলিকে, দেখলো না। কলাভবনের সামনে বটতলা একাকার। সন্ধ্যা হয় হয়। কামাল ইচ্ছে করেই দোলাকে নিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়েছে। কারণ, কখন হুড়োহুড়ি শুরু হয় কে জানে। ভিড়ের চাপ একটু বাড়লেই দোলা কামালের হাত চেপে ধরে শক্ত করে। ছোট্ট বক্তৃতা শেষ হতেই তোফায়েল আহমদ মশাল জ্বালালেন। সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে কলাভবন চত্বরে ছোট ছোট আলোর কণিকায় ভরে গেলো। কলাভবনের গেট দিয়ে বেরিয়ে পাশের রাস্তায় চলে এলো কামাল। মিছিলের সামনের দিকটা দেখতে চায়। মিছিল গেট দিয়ে বেরুলে সে ঢুকে যাবে মিছিলে। মশালের আলোয় সামনে দেখতে পায় বেগম সুফিয়া কামাল, জোহরা তাজউদ্দীনকে। একি কান্ড! মালেকা আপা, দীপাদি আছেন। তারা অবশ্যই সব সময়ই থাকেন।

একে একে মশাল জ্বলে ওঠে, যাত্রা শুরু হয়। মিছিল বেরুচ্ছে তো বেরুচ্ছেই, শেষ হয় না। মিছিল যতই এগোয় ততই আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ যোগ দেয়। একজন আরেকজনের মশাল জ্বালিয়ে দেয়। স্বেচ্ছাসেবকরা একটি দুটি করে মশাল সাপ্লাই করছে। আধঘণ্টা লাগলো কলাভবন থেকে মিছিল শেষ হতে। নীলক্ষেত নিউমার্কেটের পাশ দিয়ে মিছিল মোড় নেয় এলিফ্যান্ট রোডের দিকে। আশপাশে অনেকে পেট্রোল ভিজিয়ে মশাল তৈরি করে দিচ্ছে। কামাল আর দোলা হাত ধরাধরি করে ছুটছে। দোলার হাতে মশাল। শক্ত হাতে ধরে রেখেছে। মশালের আলোছায়া তার শরীরে। কামাল অনুমান করে মিছিলের সামনে যদি শাহবাগের মোড়ে থাকে, তারা আছে এলিফ্যান্ট রোডের মাঝামাঝি। মিছিলের শেষ ভাগ এখন নিউমার্কেটে। এলিফ্যান্ট রোডের বিভিন্ন বাড়ির ছাদ থেকে পুরুষ-মহিলা-শিশুরা হাততালি দিচ্ছে। কেউ ফুল ছুঁড়ে দিচ্ছে। ভরাট গলায় স্লোগান উঠছে, 'আসাদ ভাইয়ের রক্ত বৃথা যেতে দেব না।'

'এগারো দফা মানতে হবে।'

কামালের মনে হলো জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ দিন সে অতিক্রম করলো। মনে মনে কী লিখবে তার একটি ছকও করে ফেললো। শান্তিনগরের কাছাকাছি এসে দোলার হাত ধরে একরকম টেনে মিছিল থেকে বের

করলো কামাল। দোলা আরও যেতে চায়, ব্যাপারটা যেন নেশার মতো। ঘোরের মধ্যে আছে সে। ফুটপাতে ভিড়, মিছিল দেখছে অনেকে। পল্টনের মোড় ঘুরতেই রহিম সাহেব ও হক সাহেবকে দেখা গেলো। দোলা 'আব্বা আব্বা' করে ডাকতে লাগলো। হক সাহেব থমকে দাঁড়ালেন। মেয়েকে দেখতে পেয়ে হেসে ফেললেন। দোলা প্রায় দৌড়ে বাবার হাত ধরলো। ঘামে কপাল চকচক করছে কিন্তু হাসিমুখে সে পুরো বর্ণনা দিচ্ছে।

রাত জেগে মশাল মিছিলের একটা রিপোর্ট তৈরি করলো কামাল। কিন্তু তারপর দিন যে বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনাটি ঘটবে তা কামাল স্বপ্নেও ভাবেনি। কামাল কেন, তার বন্ধুরাও ভাবেনি।

ক

হরতাল দেখে একটু দেরিতে বেরিয়েছে কামাল। প্রায় প্রতিদিন হরতাল, লোকজন মানবে ? ভাবছে কামাল। অন্যদিন হরতালে এই সময়টা একটু সুনসান থাকে, আজও তাই, কিন্তু কামাল লক্ষ্য করলো, রাস্তায় রাস্তায় জটলা, সেক্রেটারিয়েটের দিকে যাচ্ছে অফিসমুখো মানুষ, হেঁটেই কিন্তু কোনও জটলা দেখলে থামছে আবার এগুচ্ছে। সেগুনবাগিচায় কাদেরের বাসার কাছাকাছিও দেখে জটলা। কাদেরকে ডেকে রওনা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে।

'আজ রাস্তাঘাটে মানুষজন একটু বেশি মনে হচ্ছে', কামাল মন্তব্য করে।

'কালকের মশাল মিছিলটা দেখলি না, পুরো ঢাকা শহর ভেঙে পড়েছিলো। লোকজনের মধ্যে তেজিভাব চলে আসছে।'

'তা বুঝলাম,' বলে কামাল, 'কিন্তু তেমন কোনও কর্মসূচি তো নেই, নেতারাও কিছু বলছেন না...'

'তোকে তো আগেই বলেছিলাম ডাক দিয়ে কিছু হবে না। এখন শেখ মুজিব থাকলে দেখতি...'

'শেখ মুজিব তো জেলে। বিচারের রায়ের আগে বেরুবেন কীভাবে ? আর সরকার মামলা দিয়েছে কী এ জন্য যে বিচার শেষে তিনি বেরিয়ে যাবেন আর হিরো হয়ে যাবেন ?'

'মানুষ যদি বিচার হতে না দেয়। আর্মি সবসময় ভাবে বিশেষ করে পাকিস্তানের, যে ওপরে আছে আল্লাহ নিচে আছে তারা। মানুষ কী তারা

জানে না। মানুষ জাগলে কী না হতে পারে। এদের আত্মীয়স্বজন আটকে রাখলেই তো দেখবি সব শেষ, তাদের ছেলেমেয়েরা আছে না।'

'আশাটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে কাদের। ছাত্রনেতারা আর কতদিন টানবে ?'

'ছাত্ররাই তো শুরু করে, করবেও, তারপর দেখিস কেউ না কেউ এসে যাবে।'

কথা বলতে বলতে তারা শাহবাগের মোড়ে এসে পৌঁছেছে। এখানে মনে হচ্ছে লোকের সংখ্যা বেশি। দশটা বেজে গেছে, কলাভবন থেকেও ছাত্রদের মিছিল বেরিয়েছে। টিএসসির মোড়ে এসে শুনলো মতিঝিলের দিকে বিরাট মিছিল বেরিয়েছে। সবাইকে অনুরোধ করছে অফিস থেকে বেরিয়ে আসুন। কর্মচারী কর্মকর্তারা বেরিয়ে আসছে।

'কী বলেছিলাম তোকে কামাল।' বলে কাদের। টিএসসির মোড়ে আরও কিছু বন্ধু পেয়ে যায় তারা। এসএম হলের পাশে দাঁড়ায়। দেখে পলাশী, আজিমপুর, বিভিন্ন জায়গা থেকে মিছিল বেরিয়েছে। কারও কোনও লক্ষ্য নেই। শুধু মিছিলে আছে। ফুটপাতে অনেকে দাঁড়িয়ে, অনেকে যোগ দিচ্ছে মিছিলে। স্লোগানে চারদিক প্রকম্পিত। কামালদের ছোট গ্রুপটা শহীদ মিনারের কাছে এসে পৌঁছেছে। একটু জিরিয়ে আবার এগুবে। মেডিকেল থেকে কে একজন বেরিয়ে চিৎকার করে বললো, 'গুলি চলছে, গুলি চলছে।'

'গুলি', চমকে উঠে দাঁড়ালো ওরা। কার্জন হলের দিকে এগুতেই দেখলো চাঁনখারপুল, কার্জন হলের পাশের রাস্তা, চারদিক থেকে হুড়মুড়িয়ে লোকজন নামছে। চতুর্দিকে মানুষে মানুষে একাকার। সবাই উত্তেজিত। ছাত্রীদের একটি মিছিল এসে দাঁড়িয়েছে। তিন নেতার মাজারের সামনে।

'গুলি গুলি মেরে ফেলেছে।'

শোনা গেলো, গুলি চলছে চারদিকে। কোনো এক স্কুলের ছাত্র মারা গেছে। নাম না জানা এক কিশোরও। কামাল দেখলো মেয়েদের মিছিলে মিলিও আছে। গুলিতে বাচ্চা ছেলে মারা গেছে শুনে অনেকে শাড়ির আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদছে। ঢাকা হলের সামনে থেকে এক অভিনব মিছিল। খালি গায়, ছেঁড়া হাফপ্যান্ট পরা, লিকলিকে এক শিশু শীর্ণ হাত মুঠি পাকিয়ে বলছে, 'শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না'—পেছনে ছাত্রজনতা স্লোগান দিচ্ছে। কাদের হঠাৎ এগিয়ে গেলো মেয়েদের মিছিলের সামনে। 'বোনেরা আমার কাঁদবেন না। আজ কাঁদার দিন নয়, আজ আগুন জ্বালার দিন।'

কী যে হয়ে গেলো মুহূর্তে মিছিলের মেয়েরা বদলে গেলো। ছুটে এগোতে লাগলো, কামাল একপাশ থেকে মিলির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। ধাক্কা খেয়ে থমকে দাঁড়ালো। কামাল তার হাত ধরে বললো, 'এদিকে এস। পরে যেয়ো।' মিলি হাত ছাড়াবার চেষ্টা করছে। ঘোরের মধ্যে আছে সে। কামাল শান্ত স্বরে বললো, 'মিলি আমরাও রাস্তায় আছি। গুলি চলছে, একটু সাবধানে থাকো।'

'অন্যেরা গুলি খাবে না?' ক্রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞেস করে মিলি।

'হয়ত খাবে, হয়ত খাবে না, কিন্তু আমি চাই না তুমি গুলি খাও।' থমকে দাঁড়ালো মিলি। কিছু বললো না। সেই মিছিলটা এগিয়ে গেছে। আরেকটি মিছিল আছে। কাদের এখনও একপাশে দাঁড়িয়ে। নতুন মিছিলে তারা যোগ দিলো।

সেক্রেটারিয়েটের চারপাশে মানুষ। চিৎকার করে বলছে, 'ভাইরা বেরিয়ে আসুন।' অনেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে। পুলিশ বাধা দিচ্ছে। তারপরের ঘটনাটা অস্পষ্ট। গুলির শব্দ। সেই শিশুটি লুটিয়ে পড়েছে। এক যুবক তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়েছে। রক্তে লাল হয়ে গেছে তার শার্ট। যুবকটি ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। জনতা উন্মত্ত হয়ে গেলো। সেক্রেটারিয়েটের দেয়াল ভেঙে পড়লো। মানুষ ছুটছে চারদিকে। গুলি। 'জ্বালো আগুন জ্বালো' সেগুনবাগিচার গলি থেকে বের হয় মিছিল 'জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো' কমলাপুর থেকে বের হয় মিছিল। 'মোনেম খানের গদিতে আগুন জ্বালো একসাথে' আদমজী থেকে ছুটে আসছে শ্রমিক। 'দিকে দিকে আগুন জ্বালো' সদরঘাটে নৌকা বেঁধে লগি বৈঠা নিয়ে সবাই ছুটছে মাঝি। কোনও কোনও মিছিলে লাশ, চলছে সব পল্টনের দিকে। গলিতে গলিতে গৃহিণীরা সব দরজায় দাঁড়িয়ে, রান্নাবান্নার কথা ভুলে গেছে সবাই।

দুপুরে গায়েবানা জানাজা। কামাল মিলি কাদের জিপিওর সামনে থমকে গেলো। ভেতরে ঢোকা যাচ্ছে না। পুরো শহরটা ভেঙে পড়ছে যেনো পল্টনে। গায়েবানা জানাজা শেষে আবার মিছিল। লাশ নিয়ে সবাই রওনা হয়েছে ইকবাল হলে। কামালরা ঘুরে প্রেসক্লাবে এলো। গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে। দুপুর পেরিয়েছে। পেটে খিদে কিন্তু খেতে ইচ্ছে করছে না। সব ভেঙেচুরে দিতে ইচ্ছে করছে।

'একগ্লাস পানি অন্তত খাওয়া দরকার।' বললো মিলি।

'চলো ভেতরে যাওয়া যাক।' বললো কামাল।

ভেতরে ঢোকার মুখে ফয়েজ আহমদের সঙ্গে দেখা। ঘর্মাক্ত চেহারা। উত্তেজনায় কাঁপছেন। কামালকে দেখে বললেন, 'খাইছো ?' মাথা নাড়ে কামাল। 'আসো তোমরা'।

টেবিলে বসে সবার খাবার অর্ডার দেন ফয়েজ আহমদ। কোথায় কী ঘটেছে জানতে চান। ভেজা গলায় বললেন, 'আমার সামনে মতিউররে গুলি কইরা মারলো। মাসুম চেহারা। নবকুমার ইনস্টিটিউটে মাত্র ক্লাস নাইনে পড়ে। রুস্তম ও আরও একজন যে মারা গেছে তারাও বাচ্চা ছেলে। গুলি কইরা মাইরা ফেললো ?' বিস্মিত হয়ে নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করলেন। 'শোন, গভর্নমেন্ট হাউসের সামনের পার্কটার নাম হবে মতিউর শিশুপার্ক। তোমার লেখায়ও তাই লেখবা।' নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানায় কামাল। আশে পাশে রিপোর্টাররা তাদের অভিজ্ঞতা বলছে, কেউ এসেছে মতিঝিল থেকে, কেউ গেন্ডারিয়া থেকে। কামাল সেগুলিও মন দিয়ে শুনছে। গেথে নিচ্ছে মনে। পরে, লেখায় কাজে লাগবে।

ফয়েজ আহমদ তাদের নিয়ে খাবার খেয়ে আবার বেরিয়ে এলেন। কামালরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে যাবে। রাস্তায় রাস্তায় তখনও মানুষ। হঠাৎ শোনে চিৎকার, স্লোগান, মানুষের ছোটাছুটি। তোপখানা দিয়ে একটি ছোট মিছিল দৌড়ে আসছে। কামালরা একটু এগিয়ে গেলো তোপখানা রোড ধরে। পেছনে দূরে দেখা যাচ্ছে ধোঁয়ার কুন্ডলী। 'কী ভাই কী হইছে ?' কাদের জিজ্ঞেস করে।

'দৈনিক পাকিস্তান-এ আগুন দিছে।' জানালো একজন।

'মর্নিং নিউজেও দিছে।' বললো আরেকজন। দুটি অফিসই একই বিল্ডিংয়ে।

দৈনিক পাকিস্তানে আগুন দেওয়া হয়েছে শুনে কামালের খারাপ লাগলো। তার প্রিয় পত্রিকা।

'শামসুর রাহমানদের তো কিছু হয়নি ?' জিজ্ঞেস করে মিলি।

'না তাদের কিছু হবে না,' কামাল বলে।

'কিন্তু পত্রিকা অফিসে আগুন দিয়ে লাভ কী ?'

'কামাল, যখন গণঅভ্যুত্থান হয় তখন গণবিরোধী অনেক কিছুই ধ্বংস হয় তার জন্য হাহাকার করে লাভ নেই।' বলে অনিল, 'দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকা আমাদের পছন্দ, শামসুর রাহমানরা ভালো কিন্তু পত্রিকার মালিক তো পাকিস্তান সরকার। তাকে তো ভালোবাসার কথা নয়।'

'ওদিক গিয়ে কী লাভ,' বলে মিলি, 'ফিরে যাই চলো ভার্সিটিতে।'

ভার্সিটির দিকে রওনা হয় ওরা। পুরো রাস্তাটা ছাত্র আর মানুষের জটলা। একজন বর্ণনা দিচ্ছে, আরেকজন শুনছে। এভাবে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় খবর পৌঁছে যাচ্ছে বিভিন্ন মানুষের কাছে। প্রতিটি মানুষের মুখ বিষণ্ণ।

রোকেয়া হলের কাছে পৌঁছে মিলি বললো, 'আমি যাই, ক্লান্ত লাগছে। কাল ফের দেখা হবে।'

মিছিল আসছে। সামনে লাশ। তারপর ব্যানার হাতে দুইজন—'ছাত্র হত্যার বিচার চাই।' ভিসি অফিসের সামনে পৌঁছে দেখলো কারখানার শ্রমিকরা লম্বা মিছিল নিয়ে আরেক রাস্তায়। ইকবাল হলের সামনে গিয়ে ওরা দেখল নীলক্ষেতের তিন দিক থেকেই মিছিল আসছে। ইকবাল হলের ময়দানে মানুষ আর মানুষ। রাস্তায় পুলিশ আর ইপিআর। নীরব। কয়েকজন লাশ নিয়ে সভার চারদিকটা ঘুরলো। অনেকে কেঁদে উঠলো, কান্নার দলা অনেকের গলায়, অনেকের চোখে পানি।

নেতারা একই কথা বললেন, শহীদের রক্ত বৃথা যাবে না। ১১ দফা আদায় হবেই। দাবি আদায়ে সবাই প্রস্তুত। শহীদ মতিউরের বাবাকে একজন ধরে নিয়ে এলেন সামনে। সামান্য সরকারি চাকুরে। তিনি একটি কথাই বললেন, 'আমার দুঃখ নাই, আমার মতিউর মরেছে আমি হাজার মতিউর পেয়েছি।' আবার ডুকরে কেঁদে উঠলো কেউ কেউ।

এমন সময় একজন এসে ঘোষণা দিলো, মোনেম খান কার্ফু ঘোষণা করেছে সন্ধ্যা থেকে। সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এলো। লাশ নিয়ে কয়েকটি মিছিল রওনা হলো। অনেকে দ্রুত বাসার পথে হাঁটতে লাগলো। কাদের বললো, 'এত তাড়াতাড়ি কি বাসায় পৌঁছা যাবে। চল জাহিদের হলের দিকে যাই ? অনিল রওনা হলো জগন্নাথ হলের দিকে। কামাল আর কাদের মোহসিন হলের দিকে। জাহিদ তখনও এসে পৌঁছেনি। হল তখনও প্রায় ফাঁকা। কার্ফ্যুর আগে আগে ফিরে এলো জাহিদ। বললো, 'আয় থাকবি তো।'

কার্ফ্যু শুরু হবে আটটা থেকে। তার আগেই অনেকে খেয়ে নিচ্ছে। জাহিদ বললো, 'তোদের বাসায় চিন্তা করবে না।'

'তা করবে, কিন্তু বলেছি বাসায় না ফিরলে ধরে নিতে, হলে আছি। আর এখন ফিরতে পারবো না, ফিরতে ইচ্ছেও করছে না।'

ডাইনিং হলে ভিড়। কোনোরকমে দুটি খেয়ে জাহিদের রুমে ফিরে এলো ওরা। জাহিদের ঘরে দুটি খাট। জাহিদের রুমমেটসহ চারজন থাকা যাবে। রাস্তাঘাট নিঝুম হয়ে আসছে। সারাদিনের কথা আলোচনা হচ্ছে। কী হবে, কী হতে যাচ্ছে ?

'জাহিদ, কাগজ দে তো কিছু', কামাল বলে। কাদের শুয়ে আছে। জাহেদ জানালার কাছে দাঁড়িয়ে। জাহিদ বলে, 'কী করবি ?'

' লিখব।'

'লিখবি ?' জাহিদ অবাক।

'হ্যাঁ, আজ যা ঘটলো তা লিখে রাখা দরকার। এ রকম ঘটনা আর আগে ঘটেনি। সামনে ঘটবে কি না জানি না। এখন না লিখলে ভুলে যাব।'

'বর্ণনা হয়ত লিখতে পারবি। কিন্তু এই ক্রোধ, আবেগ, ঘৃণা' কাদের শুয়ে শুয়ে বলে।

'না, অতো বড় লেখক আমি নই,' স্বীকার করে কামাল, 'কিন্তু চেষ্টা করতে দোষ কী। আজ থেকে ৪০/৫০ বছর পরের কথা ধর। তখন তো আজ ইতিহাস। আমরা সেই ইতিহাসের সাক্ষী, নায়কও বলতে পারিস। কেউ যদি আজকের কথা জানতে চায় তাহলে হয়ত খানিকটা কাজে লাগবে।'

খ

কামাল লেখা শুরু করে। আপনাআপনিই তার কলম চলতে শুরু করে। কামাল নিজেই এক সময় অবাক হয়। কলম তার ভাবনার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না। তাদের সমস্ত রাগ, ঘৃণা, ভালবাসা উগড়ে দিতে থাকে সে—

শুক্রবারের সর্বাত্মক হরতাল সাধারণ মানুষকে যেমন দেখেছি
"নয়া ইতিহাস লিখেছে ধর্মঘট, রক্তে রক্তে আঁকা প্রচ্ছদপট।

শুক্রবার ঢাকা শহর ছিলো মিছিলের শহর। ভোরে কাক-ডাকার আগেই প্রতিটি মহল্লায় তরুণ, কিশোর, যুবকবৃন্দ মোড়ে মোড়ে জমায়েত হয়, আর খন্ড খন্ড মিছিলে শরিক হয়—নিজ নিজ এলাকা পরিক্রমণ করে। সবার চোখে আগুনের হলকা, মুখে নির্ভীক ভ্রূকুটি, আর কণ্ঠে বুলন্দ আওয়াজ। মহল্লার এ সব খন্ড মিছিলে আমি দেখেছি পানওয়ালা, মজুর, রিকশাওয়ালা আর সাধারণ মেহনতী মানুষ। কিন্তু তাদের মহল্লা ঘোরার বুঝি দরকার ছিলো না। কারণ কোন দোকানপাট, যানবাহন চালু ছিলো না। এমনকি কাঁচা বাজারগুলোও জনশূন্য অবস্থায় খাঁ খাঁ করছিলো।

"অভিজাত আবাসিক এলাকার অফিসার আর ঊর্ধ্বতন কর্মচারী, বিভিন্ন অফিস-আদালতের কিছু সংখ্যক সাধারণ কর্মচারী কাক-ডাকা ভোরে চোখে পানি দিয়ে মুখে কিছু গুঁজে অফিসের দিকে পায়ে হেঁটে রওনা দেয়, এমন

কিছু অফিসারের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। তাদের একজন বলেন—কী করব ভাই, ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার করি, চাকরিটা তো রাখতে হবে। হেঁটে এই সকালে রওনা হয়েছি। তবে আমার কোনও দুঃখ নেই, আজকে হেঁটে কষ্ট করছি এই ভরসায় সুদিন আমাদের আসবেই।

"একজন নিম্ন বেতনভূক কর্মচারী বললেন—বিশ্বাস করুন, এই মিছিলে শরিক না হতে পেরে ক্ষোভে নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছে করছে নিজের চুল দুহাতে ছিঁড়তে। মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছে, যাক শালার চাকরী। আবার পরক্ষণে সংসারের দায়ের কথা মনে পড়ছে, আপনি খবরের কাগজের লোক। বুকে হাত দিয়ে বলছি ভাই ছাত্র ভাইদের সাথে ঝাঁপিয়ে পড়তে আমাদেরও মন চাইছে—কী করব আমাদের উপায় নেই। তবে ওদের জানাবেন আমাদের বুকেও আগুন জ্বলছে। তুষের আগুনের মতো ধিকি ধিকি জ্বলছে।

"এক বুড়ো বললেন—জানি আমাদের অফিস যেতে দেখে আপনারা ধিক্কার দিচ্ছেন। কী করব আমরা যে নিরুপায়। সরকারি চাকরী করি, নিয়মের দাস আমরা, তবে আমি দোয়া করছি যারা মানুষের জন্য প্রাণ দিচ্ছে তারা যেন জয়ী হয়। আমার বয়স ৬০ বছর। আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি। খোদা আমার দোয়া শুনবে। ওদের ভালো হবে, সবার ভালো হবে। বলতে বলতে বুড়ো কেঁদে ফেললেন।

সকাল দশটার মধ্যেই সারা শহর অগণিত খন্ড মিছিলের শহরে পরিণত হয়। সব পথে মিছিল, কোথাও শ্রমিকের মিছিল, কোথাও মেহনতী মানুষের মিছিল। মিছিল আর স্লোগান। যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই মানুষের মিছিল আর যেদিকেই কান যায় সেদিকেই বিক্ষুব্ধ মানুষের স্লোগান। সূর্যের তাপ যত প্রখর হয়, রাজধানীর পরিবেশ তত প্রতিবাদমুখর হয়। এরই মধ্যে পাঁচ-ছয় হাজার মানুষের একটি মিছিল মতিঝিলের বাণিজ্যিক এলাকায় যেতে থাকে। তারপর তারা শুরু করে এক অভিনব আবেদন। বিভিন্ন আবেদন। বিভিন্ন অফিসের চারদিক ঘিরে হাতজোড় করে আবেদন করতে থাকে তারা—ভাইসব বেরিয়ে আসুন, ছাত্র হত্যার প্রতিবাদ করুন, আমাদের মিছিলে শরিক হোন। যারা চাকুরী রক্ষার দায়ে সকল আবেগ আর অনুভূতিকে চোখ-মুখ-কান বুঁজে রোধ করে অফিসে এসেছিলো মিছিলের কান্নাভেজা স্লোগান তাদের বুকে গিয়ে বাজে। আর নয়, আর নয় বিবেকের সাথে ছলনা (একজন কর্মচারী এ উক্তি করেছেন) এবার তারা দলে দলে ছোটে অফিসের বাইরে। সব কর্মচারী, পিওন-চাপরাশী, বড় সাহেব, ছোট

সাহেব সবাই মিছিলে নামে। এমনকি ওয়াপদার চেয়ারম্যান জনাব মাদানী, ডিআইটির চেয়ারম্যান জনাব খায়ের, ইপিআইডিসির চেয়ারম্যান জনাব আহসানও বেরিয়ে আসেন। কর্মচারীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মিছিলে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে ঘোষণা করে শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না। জনাব খায়ের তো মিছিলের সাথে বেশ কিছুক্ষণ এগিয়ে যান। জনাব আহসানের চোখে আমি পানি দেখেছি। এভাবে পাঁচ হাজারের মিছিল পনের হাজারে পরিণত হয়। গোটা শহর বিক্ষোভ নগরীতে পরিণত হয়। যে দিকেই যাই, দেখি শুধু হাজারো মানুষের বলদৃপ্ত পদভারে থর থর কম্পমান রাজধানীর রাজপথ। তখন আমি ছিলাম এসএম হলের সামনে একটা পাঁচ হাজারী মিছিলের পাশে। হাজারীবাগের শ্রমিক, লালবাগের শ'কয়েক মেহনতী মানুষ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। এমন সময় দেখি, পাঁচ-সাত জন ছাত্র খালি পায়ে পাগলের মতো ছুটে আসছে। ওরা এসে কাঁদতে কাঁদতে ঘোষণা করলো—ওরা আবার গুলি করেছে। আবার মানুষ মেরেছে।

'কী ? সমগ্র মিছিল স্তম্ভিত। বিক্ষুব্ধ মানুষগুলি যেন মৃতপ্রায়। নীরব নিথর হয়ে গেলো। মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়লো খবর আবার মরেছে, মানুষ মরেছে। দশ মিনিট হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকলো মিছিল। হু হু করে কেঁদে ফেললো অনেক ছাত্র। শুরু হলো কান্নার স্লোগান মরেছে মরেছে ভাই মরেছে।' কান্নামাখা স্লোগান কত মর্মস্পর্শী হতে পারে, বুকের কত গভীরে যেয়ে বাজতে পারে তা এখানে যারা ছিলেন না তাদের বোঝানো যাবে না। এমন সময় রোকেয়া হলের ছাত্রীদের মিছিলটা এলো। আবার মৃত্যুর খবর শুনে মেয়েরা শব্দ করে কেঁদে উঠলো। সে কী কান্না! সে কী দৃশ্য! অকস্মাৎ মিছিলের রূপ পাল্টে গেলো। যে মিছিল ছিলো প্রতিবাদ, শোক প্রকাশ আর বিক্ষোভের মিছিল, মুহূর্তে তা পরিণত হলো জঙ্গি মিছিলে। মুহূর্তে কান্না ভুলে গেলো তারা, চোখের জল দুহাতে মুছে বজ্রমুষ্টি আকাশে ছুঁড়ে তারা ঘোষণা করলো 'জ্বালো জ্বালো—আগুন জ্বালো। দিকে দিকে আগুন জ্বালো', 'শহীদদের রক্ত বৃথা যাবে না', 'আসাদ ভাইয়ের রক্ত বৃথা যাবে না'। কিছু মেয়ে তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো। হঠাৎ দেখলাম একজন ছাত্র মিছিলের পুরোভাগে এসে শাণিত কণ্ঠে ঘোষণা করলো—'বোনেরা আমার, আমরা কাঁদবো না। কেঁদে কেঁদে তাদের দেখানো চলার পথ আমরা পিচ্ছিল করে দেব না, ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেলো যারা জীবনের জয়গান, আসি অলক্ষ্যে দাঁড়িয়েছে তারা দেবে কোন বলিদান ?' বোনেরা আজ আসাদ ভাই এসে দাঁড়িয়েছে, আসুন কে দেবেন বলিদান ? বুলেটকে আমরা

পরোয়া করি না। আমরা জানি বুলেট শুধু রক্ত ঝরাতে পারে—প্রাণ অথবা অন্য কিছু নয়। ছেলেটির বক্তৃতার পর পরই দেখলাম মিছিলটা দৌড়াতে শুরু করলো। আমায় ছেড়ে মিছিলটা চলে গেলো। শুনলাম, তারা ভাইয়ের লাশ আনতে গেলো। তখন মহল্লায় মহল্লায় যেয়ে দেখলাম সেখানকার রূপ পাল্টে গেছে। প্রতিবাদের স্থলে দেখলাম একটা থমথমে ভাব। মুখে মুখে ফিরছে, শুনছে শহরে আবার গুলি হয়েছে। বাড়ির দরজায় বুড়ো গিন্নিদের শুকনো মুখ। তরুণ ও যুবকরা তখন মিছিলে গেছে।

"গেন্ডারিয়া, কমলাপুর আর নওয়াবগঞ্জের আবাসিক এলাকায় আমি দেখেছি এক মর্মান্তিক দৃশ্য। এইসব এলাকার বাড়িতে বাড়িতে মরা কান্নার বিলাপ শুনেছি। ছোট খোকনকে বুকে চেপে ধরে মাকে বলতে শুনেছি, না—কিছুতেই আর সহ্য করব না। আমার যাদুদের খুন আর নিতে দেব না। নওয়াবগঞ্জের এক প্রৌঢ় বলেছেন—নয় বছরের রুস্তমকে কেন মারলো ওরা। ওরা আমাদের দেখতে পায় না। আমাদের গুলি করুক। বুড়োদের গুলি করুক, নয় বছরের নিষ্পাপ শিশু কি দোষ করেছে ? গেন্ডারিয়ার সেই ইমামের ফরিয়াদ, আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না। মসজিদের সেই ইমাম হত্যার খবর শুনে মোড়ের পানের দোকানের সামনে দুই হাত আকাশের দিকে তুলে ফরিয়াদ করলো, হে খোদা তুমি দেখো না, জালেমের এই অত্যাচার তুমি কি দেখো না। এ মাসুম বাচ্চাদের খুন করলে তুমি ? কী দেখো না ? হে রাহমানুর রহিম, তুমি গজব নাজেল করো খোদা, তুমি গজব নাজেল করো। এ আর সহ্য হয় না। সে সময় ইমামের সাথে আর যারা ছিলো সবাই মুনাজাতের মতো হাত তুলে ফুঁপে ফুঁপে কাঁদছিলো। সেখান থেকে প্রেসক্লাবে আসার পথে একটা কবিতা আমার কানে বাজলো

> **'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু**
> **'নিভাইছে তব আলো—**
> **তুমি কী তাদের ক্ষমা করিয়াছ**
> **তুমি কী বেসেছ ভালো'।**

প্রেসক্লাবে এসে খবর পেলাম বিক্ষোভ আর মিছিলের। খবর পেলাম বিক্ষুব্ধ জনতা আগুন লাগিয়েছে প্রেস ট্রাস্ট কাগজের অফিসে আর সেক্রেটারিয়েট ভবনের দেয়ালে। খবর পেলাম সংঘর্ষের। তখন ৪টা হবে। দেখলাম লাশ নিয়ে মিছিল আসছে একটা। দুই-তিনটা লাশ। লক্ষ লক্ষ জনতা সে মিছিলে। কারখানার শ্রমিক দেখলাম। তার হাতে ব্যানার, 'ছাত্র আসাদ আমাদের ভাই', শ্রমিক ফেডারেশন। লাঙ্গল আর কোদালবাহী কৃষক দেখলাম তাদের হাতে ব্যানার, 'ছাত্র হত্যার বিচার চাই', কৃষক সমিতি,

অগণিত জনতা সে মিছিলে। শুধু মানুষ আর মানুষ। আমি হারিয়ে গেলাম সেই মানুষের ভিড়ে, মিছিলের পথে পুলিশ আর ইপিআর ছিলো। কিন্তু তারা ছিলো একেবারে নীরব। মিছিল এসে থামলো অনেক সংগ্রামের সৃতিকাগার ইকবাল হলে। ইকবাল হলো ময়দান কালো কালো মাথায় ভরে গেলো। শুরু হলো ছাত্রদের সভা। শুরুতেই লাশ ঘাড়ে করে সভার প্রত্যেক প্রান্তেই ঘুরিয়ে নেওয়া হলো। সে সময় সৃষ্টি হলো আরেক মর্মভেদী দৃশ্য। শহীদের মুখ এক নজর দেখার জন্য সবার সে কী আকুতি। ছাত্ররা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, ভাইসব বসুন। কিন্তু কে শোনে কার কথা। শহীদের লাশ দেখে সবার চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠলো। কেউ আবার হু হু করে কেঁদেও উঠলেন।

ছাত্ররা বললো তাদের বক্তব্য। ঘোষিত হলো তাদের মুক্তি সনদ মহান ১১ দফা। এরপর মতিউর রহমানের শোকাতুর পিতা আজহার মল্লিক এক হাতে কাঁধে ভর দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘোষণা করলেন—আমার দুঃখ নাই, আমার মতিউর মরেছে আমি হাজার মতিউর পেয়েছি। আমার দুঃখ নাই। সে সময় মনে পড়লো আরও দুটি ঘটনা। একটি ১৩ বছরের শিশু রুস্তমের নানার। আমার রুস্তম অমর, আপনাদের মধ্যে বেঁচে আছে। আর অপরটি শিবপুর থেকে পাঠানো শহীদ আসাদের মায়ের বাণী। সে বাণীতে বলা হয়েছে—আমার আসাদের মৃত্যু হয়নি। আমার আসাদ বলতো 'মা আগামী দশ বছরের মধ্যে এই মাতৃভূমি নতুন জীবন পাবে। আমার আসাদের এই স্বপ্ন তোমরা সার্থক করো।'

'শহীদ আসাদের পথ ধরে প্রাণ দিলো ১৩ বছরের কিশোর তরুণ, ১৭ বছরের ছাত্র মতিউর, ১৫ বছরের মকবুল আরও নাম না জানা কতজন কে জানে। আমি ভাবছি পৃথিবী কী উল্টো ঘুরছে ? কোথায় কখন কবে কোন তারা ঝরে যায় আকাশ কী তার হিসাব রাখে না ? পরক্ষণেই শুনলাম, আবার শ্লোগান। ভাবলাম, 'পৃথিবী আজ উল্টো ঘোরেনি, এগিয়ে গেছে'।

গ

'কার্ফু ভাঙিলাম, রাস্তায় নামিলাম।'

শ্লোগান শুনে চমকে ওঠে কামাল। গভীর রাত। একটানা এতক্ষণ সে লিখেছে। শেষ বাক্যটা শেষ করেছে এমন সময় এই শ্লোগান। ভুল শোনেনি তো।

'কার্ফু মানি না, শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না।' আবার স্লোগান। নিস্তব্ধ রাত। এই স্লোগানের শব্দ ভেঙে খান খান হয়ে গেলো।

'এই কাদের, জাহিদ ওঠ।' কামাল কাদেরকে ধাক্কা দেয়। 'স্লোগান চলছে।'

চোখ কচলে ওঠে দুজন। তখনই গুলির শব্দ পরপর। চিৎকার করে ওঠে কেউ একজন। 'মাইরা ফেলছে মাইরা ফেলছে মাইরা ফেলছে।' বহু কণ্ঠের চিৎকার।

দরজা খুলে বেরিয়ে আসে ওরা। নীলক্ষেতের বস্তির পাশে রাস্তা, অন্ধকার। আওয়াজটা সেখান থেকে আসছে। এবার অন্য প্রান্ত থেকে স্লোগান ওঠে, সৈন্যরা গুলি চালায়। বস্তির মানুষজন রাস্তায় নেমে পড়েছে। ছাত্ররা করিডোরে ছোটাছুটি করছে, কেউ দরজা খুলছে, গুলির শব্দ পেয়ে কেউ দরজা বন্ধ করছে। দশ বারো জন মিলে স্লোগান ধরে 'আসাদ ভাইয়ের রক্ত বৃথা যেতে দেব না।'

'মতিউরের রক্ত বৃথা যেতে দেব না।' স্লোগান ওঠে নিচতলা থেকে। এক সময় সারাটা হল গম গম করে ওঠে। নীলক্ষেতের রাস্তায় স্লোগান থেমে যায় এক সময়। গুলির শব্দ, ছাত্রদের স্লোগানও। আবার নিঝুম হয়ে ওঠে সব।

আধো ঘুমে কাটে সারা রাত। দেরি করে ঘুম ভাঙে। হাতমুখ ধুয়েই কামাল ভেবেছিলো বাসার দিকে রওনা দেবে। পরে মনে হলো, তা কীভাবে সম্ভব, কার্ফু তো রাত পর্যন্ত। নিশ্চয় আব্বা-আম্মা কাতর হয়ে আছেন। তবুও একবার নিচে নামে। চারদিকে সুনসান, হলের অধিকাংশ ছাত্র ঘুমিয়ে, রাত জেগেছে তারা। ক্যান্টিনে নাস্তা করতে করতে শোনে গতকাল বেশ ক'জন মারা গেছে। কার্ফু বাড়ানো হয়েছে আরও ২৪ ঘণ্টা। এবার খুব চিন্তায় পড়ে কামাল।

দু-একজন ছাত্র এই কার্ফুর মধ্যেও ইকবাল হলে পৌঁছে। খবরাখবরের জন্য সবাই অস্থির। ক্যান্টিনের খাবারও শেষ হয়ে আসছে। দুপুরের দিকে কামালরা শোনে, আদমজী থেকে প্রকাশ্যেই কার্ফু ভেঙে সকালে মিছিল করেছে, সেনাবাহিনী পথে ব্যারিকেড দিয়েছে। গুলি হয়েছে বৃষ্টির মতো। মারা গেছে কয়েকজন।

বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে চা খাচ্ছিলো কামাল। এ ধরনের পরিস্থিতি তারা আগে কখনও দেখেনি। সবার আলোচনার মূল বিষয়, কী হবে ? নেতারা চুপ কেন ? রাজনৈতিক দল না এগুলে কীভাবে চলবে ?

আবার সন্ধ্যা নামে। একই আলোচনার বিরতি। কেউ শুয়ে থাকে, কেউ বই পড়ে। রাতে রেডিওর খবরে জানা যায়, কার্ফুর মেয়াদ আরও বাড়ানো হয়েছে। অবশ্য মাঝে তিন ঘণ্টা বিরতি।

পরদিন কামাল, কাদের তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে। কাদের হলের এক বন্ধু থেকে একটা সাইকেল ধার নিয়েছে। রিকশা যদি না পায়। কামালকে সামনে বসিয়ে রাস্তায় বেরোয়। কামাল বলে, 'একটু ঢাকেশ্বরী হয়ে যান লেখাটা দিয়ে যাবো।' কাদের রাজি হয়। রাস্তায় কিছু মানুষ বেরিয়েছে, যারা আটকে পড়েছিলো বিভিন্ন জায়গায়। কিছু দোকান খুলেছে। তাড়াতাড়ি কেনাকাটা সারছে সবাই। ভয় সবার চোখেমুখে।

আজাদ অফিসে বার্তা সম্পাদককে পেলো না কামাল। পিয়নকে লেখাটা দিয়ে আবার রওনা হলো, কাদের কামালকে গেটের সামনে নামিয়ে চলে গেলো।

কামাল গেট খুলে ভেতরে ঢুকেই দেখে, দোলা দাঁড়িয়ে আছে, দেখেই মুখে হাসি ফোটে। চিৎকার করে ওঠে, 'কামাল ফিরেছে। কামাল ফিরেছে।' সিঁড়িতে পা রাখতে দেখেই দোলা দরজা খুলে ছুটে এলো, 'কোথায় ছিলি চিন্তায় আমরা সবাই মরে যাই'

'আমার জন্য চিন্তা করিস নাকি ?' কামাল হেসে জিজ্ঞেস করে।

'না, আমি তোর কে যে চিন্তা করবো ?' রাগ রাগ গলায় বলে দোলা। হক চাচা-চাচি বেরিয়ে এসেছেন। চাচি তার মাথায় হাত রেখে জিজ্ঞেস করেন, 'কোথায় ছিলি বাবা, তোর মা তো খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, যা ওপরে যা।'

কামাল ওপরে ওঠে।

মা তাকে দেখে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেন। বাবা বেরিয়ে আসেন। অপরাধীর মতো লাগে নিজেকে।

'তোর একটা কান্ডজ্ঞান নেই,' বলেন রহিম সাহেব।

'না, আব্বা,' বলে কামাল, 'আমি তো আপনাকে বলেছিলাম, রাতে না ফিরলে ভাববেন হলে আছি।'

'আরে, তোর ছেলে না হলে তুই বুঝবি কীভাবে ?' বিরক্তির স্বরে বলেন তিনি, 'এবার একটা ফোন আনতেই হবে।'

'আহ্ বকাবকি করো না তো। তুই কিছু খেয়েছিস ?' রহিম সাহেবকে বকুনি দেন কামালের মা। কামাল ঘাড় নাড়ে।

'হাত মুখ ধুয়ে আয়, নাস্তা দিই,' বলে রান্নাঘরের দিকে ছোটেন।

বিকেলের পর করার কিছুই নেই। রাস্তাঘাট খালি, তবে দু-একজন যে ছুটে এদিক সেদিক যাচ্ছে না তা নয়। কামাল আর দোলা গেটের পেছনে দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখে। দু-একজনের ছোটাছুটি দেখে, কথা বলে। রাতে শোনে কার্ফু আরও বাড়ানো হয়েছে ৩৬ ঘণ্টা। রহিম সাহেব রাতে কামালকে ডেকে বাসায় কার্ফু জারি করেন। 'কামাল, যথেষ্ট হয়েছে, তুমি আর বাইরে যাবে না।' কড়া গলায় বললেন, রহিম সাহেব। কামালের আর কথা বলার সাহস হয় না।

মাঝখানে একটু বিরতি দিয়ে আরও ৪৮ ঘণ্টার কার্ফু। কামাল ভাবে, এভাবে সে থাকতে পারবে না। খাবার সময় রহিম সাহেবকে বলে, 'আমি তাহলে বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। দাদাদের তো খবর নেই অনেক দিন।'

রহিম সাহেব খুশি হন। ছেলে, একমাত্র ছেলে শহরে না থাকলে তিনি বাঁচেন। যেভাবে গুলিগালা চলছে। কখন কী হয় কে জানে।

'খুব ভালো,' বললেন তিনি, 'আব্বা-আম্মার খোঁজ নেওয়া হয়নি অনেকদিন। পারলে তোর বন্ধুদেরও নিয়ে যা ভালো লাগবে।'

এটি বোনাস। কামাল ভাবে বন্ধুরা কি রাজি হবে ? আর বাড়ি যাওয়ার মতো ঘনিষ্ঠ বন্ধুই-বা তার কয়জন। মাসের শেষ তারিখে কার্ফু উঠলে কামাল বের হয়। যায় কাদেরের বাড়ি। কাদেরের খালার এক কথা, কাদের বেরুতে পারবে না। ওর কিছু হলে বোনকে কী জবাব দেবেন।

'আচ্ছা খালা আমি দেশে যাচ্ছি কয়েকদিনের জন্য। কাদের আমার সঙ্গে গেলে আপত্তি আছে।'

খালার চিন্তাও রহিম সাহেবের মতো। কাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, 'যাবি তুই ?'

'যাবো না আবার,' কাদের বলে, 'অন্তত তোমার হাত থেকে বাঁচার জন্য তো যাবো।' খালা হেসে ফেলেন।

কাদের বলে, 'চল অনিলকে বাদ দেই কেন।'

ঘ

চাঁদপুরের এক গণ্ডগ্রামে থাকেন কামালের দাদা হাজী আবদুস সোবহান। তাঁর এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলে কামালের বাবা, আরেক মেয়ে কামালের ফুপু থাকেন রাজশাহীতে। দাদা-দাদী একা থাকেন গ্রামের বাড়িতে। জমি-জমা আছে বেশ। আবদুস সোবহান ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলেন। নিজ

গ্রামে তিনি একমাত্র হাজী। সে জন্য কামালের দাদার বাড়ি হাজীবাড়ি নামেও পরিচিত। কামালের দাদা গ্রাম ছেড়ে খুব একটা নড়েন না। কামালের মনে আছে তারা যখন চট্টগ্রামে তখন দু'একবার গিয়েছিলেন। সৈয়দপুরে একবারও না, রাজশাহীতে তো নয়ই। মাঝে মাঝে অবশ্য মানুষজন দিয়ে চাল, মুড়ি, নারকেল পাঠিয়ে দেন ছেলেমেয়ের বাসায়। কামালের বাবা বছরে অন্তত একবার একদিনের জন্য হলেও ঘুরে যান। এক ছেলের এক ছেলে, নাতি কামাল দাদা-দাদীর খুবই স্নেহের পাত্র, যদিও যোগাযোগটা কম। স্কুল-কলেজে থাকতে ছুটির সময় কামাল, একনাগাড়ে দিন দশেক করে কাটিয়ে গেছে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর আসেনি।

খুব ভোরেই অশান্ত ঢাকা ছেড়ে রওনা হয়েছে তিন বন্ধু। কামালের বাসায় এসেছে কাদের আর অনিল। তারপর এক রিকশায় তিনজন রওনা হয়ে সদরঘাট। সেখান থেকে লঞ্চে যাবে চাঁদপুর।

ঢাকার পরিস্থিতি খানিকটা শান্ত। মজা হলো ঢাকার কার্ফুর মেয়াদ শেষ হতে না হতেই করাচিতেও ৪৮ ঘণ্টার কার্ফু দিতে হলো। ঢাকার খবরাখবর পেয়ে করাচির ছাত্ররাও রাস্তায় নেমে পড়েছে। ঢাকায় কার্ফুর মধ্যেও অনেককে গ্রেফতার করা হয়েছে। আগরতলা মামলার শুনানিও শেষ করে ফেলা হয়েছে, তবে আশার খবর মওলানা ভাসানী আবার নেমেছেন। বক্তৃতা বিবৃতি দিচ্ছেন।

লঞ্চ ছাড়া মাত্র তাদের মনে হলো ঢাকার ঐ দিনগুলো যেন স্বপ্নের ঘোরে কেটেছে। যদিও চার সপ্তাহ মাত্র। বুড়িগঙ্গা, একপাশে ঢাকা শহর অন্যদিকে গ্রামের সবুজ, হু হু হাওয়া শরীর-মন জুড়িয়ে দেয়। তিনজনে বসে ডেকে। কামাল যতবার লঞ্চে যাওয়া-আসা করে ততবার মুগ্ধ হয়ে যায়। অনিলের অবশ্য তেমন কোনো ভাবান্তর হয় না। নদীর ওপরে বজ্রযোগিনীতে বাড়ি। নদীতেই তাদের একরকম বসবাস।

'একবার ঢাকা থেকে রকেটে বরিশাল যেতে হবে,' বলে কামাল, 'নদীর পর নদী পেরিয়ে, চমৎকার, একবার গেলে ভোলা যায় না।'

'এসব ঝামেলা, তারপর সাবসিডিয়ারি পরীক্ষাটা শেষ হোক, আবার একসঙ্গে যাওয়া যাবে। দরকার হলে সঙ্গীসাথী বাড়িয়ে নেব।'

রাজনীতির গল্প বাদ। তারা চা খায়, নদী দেখে। হু হু বাতাসে এক সময় আরামে চোখ বুজে আসে। সারেংয়ের কেবিনে দেয়ালে পিঠ রেখে ঘুমিয়েও পড়ে। এক সময় কোলাহলে ঘুম ভাঙে। চাঁদপুর এসে গেছে।

পাটাতন ফেলা হচ্ছে, যাত্রীরা নামবে বলে। আড়মোড়া ভেঙে ওরা নেমে আসে। দুপুর যদিও রোদের তাপ তেমন নেই। লঞ্চঘাটটা ঘুরে দেখে সামনের এক রেস্টুরেন্টে বসে দুপুরের খাবারের জন্য। ধোঁয়া ওঠা ভাত, নদী থেকে সদ্য তোলা মাছের তরকারি আর ডাল দিয়ে চমৎকার খাওয়া। কাদের তো বলেই ফেললো, 'এখানে খাবারের স্বাদই আলাদা। মনে হয় ঢাকায় থাকি আর এখানে দু'বেলা খাই।'

ভরপেট খেয়ে একটু জিরালো তারা। তারপর চাঁদপুর কুমিল্লা যাওয়ার লক্কর মার্কা বাসে উঠলো। রাস্তা খুবই খারাপ। আইয়ুব খানের উন্নয়ন পুরো দেশে হয়নি। কিছু কিছু জায়গায় হয়েছে। হাজিগঞ্জ এসে বাস থেকে নেমে পড়ে।

হাজিগঞ্জ থেকে পাক্কা ছয় মাইল হেঁটে যেতে হবে। বর্ষায় নৌকো যায়। এখন তো খালের পানি অনেক জায়গায় কমে গেছে। নৌকো আটকে যাবে। পড়ন্ত বিকেলে তিন বন্ধু রওনা হলো ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা ধরে।

'ছয় মাইল হাঁটতে পারবি তো ?' জিজ্ঞেস করে অনিল। 'তোরা তো আবার শহুরে মানুষ!'

'ঢাকায় ডেইলি কয় মাইল হাঁটি মিটিংয়ে-মিছিলে ?' বলে কাদের।

সূর্যটা হঠাৎ ডুবে যায়। চারদিকে আঁধার ঘন হয়ে ওঠে। মেটে চাঁদের আলোয় পথ দেখতে হয়। রাস্তাটা এতো সরু যে তিনজন পাশাপাশি হাঁটতে পারে মাত্র। চারদিকে সব অন্ধকার তবে অন্ধকারে গাছগাছালির ছায়া দেখা যায়। দুএকটা জোনাক পোকা উড়ে যায়। কখনও কখনও শোনা যায় ঝিঁঝিঁর শব্দ। খালের পাড় দিয়ে যাওয়ার সময় পাওয়া যায় পানি আর কচুরিপানার গন্ধ।

মাঝে-মাঝে হালকা বাতাসে ভেসে আসে ফসলের গন্ধ। নীরবে তারা হাঁটে। বহুদিন পর হঠাৎ চারদিকের এই নীরবতা তাদের যেন স্তব্ধ করে দেয়। মাঝে-মাঝে দু-একজনের সঙ্গে দেখা হয়, হ্যারিকেন হাতে যাচ্ছে। কারও হাতে টর্চ। দেখা হলেই জিজ্ঞেস করে, 'কে ও ?'

গ্রামে সবাই সবাইকে চেনে, ইউনিয়নের কমবেশি সবাই সবাইকে জানে। তাই অচেনা কোন মুখ চোখে পড়লেই প্রথমেই পরিচয় জানতে চায়, নিশ্চিত হতে চায়।

'রোহিতপুরের হাজী সাহেবের বাড়ি।' বলে কামাল।

এখানে কামাল উদ্দিন রহিম বলার কোন অর্থ নেই। পরিচয়টা কোন গ্রাম, কোন বাড়ি। তার দাদা হাজী, সুতরাং হাজীবাড়ি। ইউনিয়নের সবাই চেনে।

গ্রামের রাস্তায় এসে যখন পৌঁছালো ওরা, তখন প্রায় রাত ৯টা। গ্রামের দিক ধরলে গভীর রাত। দুপুরে যা খেয়েছিলো তা হজম হয়ে গেছে। ওরা বোঝেনি একটানা ছয় মাইল হাঁটা ওদের ক্লান্ত করে দেবে।

কামালের দাদার বাড়ির সামনে দিয়েই রাস্তা চলে গেছে। বাড়ির সীমানায় একটা আমগাছ, নিচে একটা মাচা। তারপর বিলে খানিক সবুজ খালি জায়গা, একপাশে পুকুর, তারপর কাচারি বাড়ি। চারদিকে ফলের গাছ। কাচারির পাশে ফলের গাছ পেরিয়ে অন্দর মহল। উত্তর-দক্ষিণ-পশ্চিমে বাড়ি। পূবে-পশ্চিমে রান্নাঘর, পাশে পুকুর। কামাল দু'বন্ধুকে বন্ধ কাচারির সিঁড়িতে বসিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলো। দাদা-দাদীর ঘরে লণ্ঠন জ্বলছে, দাদা বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে, দাদী ঘরে।

পায়ের শব্দে তিনি ফিরে তাকান অন্ধকার পথের দিকে, শব্দটা অচেনা লাগে, জিজ্ঞেস করেন, 'কে রে ?'

'আমি কামাল।'

মুহূর্তে সোজা হয়ে দাঁড়ান। হাঁক পাড়েন, 'ও রহিমের মা, নাতি আইছে, নাতি আইছে।' দাদী প্রায় ছুটে বেরিয়ে আসেন। কামাল এগিয়ে এসে দাদা-দাদীকে সালাম করে। দাদা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। কামাল বলে, 'শোনেন, এক নম্বর, আমার সঙ্গে বন্ধু আছে দুজন, কাচারিতে তাদের থাকার বন্দোবস্ত করেন। দুই নম্বর, খিদায় জান শেষ। ভাত-ডাল থাকলে খালি ডিমের মামলেট করেন। আর ভালো খাওয়াইতে চাইলে কাল খাসি জবাই করেন।' ঠাট্টার সুরে বললো কামাল।

দাদা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, হ্যারিকেন হাতে হাঁক-ডাক দিয়ে কাজের লোকদের ওঠালেন। কাচারি খোলালেন। কামাল, পরিচয় করিয়ে দিলো। 'আমার বন্ধু কাদের ও অনিল।' কাদের সালাম দিলো, অনিল বললো, 'আদাব।'

'আদাব', উত্তর দিলেন দাদা গম্ভীর হয়ে।

তারা হাতমুখ ধুয়ে জিরিয়ে নেওয়ার আগেই খাবার চলে এলো। সত্যি সত্যিই ডিম মামলেট। খিদে ছিলো, অমৃতের মতো লাগলো। খাবার খেয়ে কামাল বললো, 'তোরা শুয়ে পড়, সকালে বের হওয়া যাবে।'

কামাল চলে গেলো ভেতরে। দাদা অপেক্ষা করছিলেন দাওয়ায়। নাতির জন্য একটা চেয়ার রাখা হয়েছে। কামালের বাবা-মা'র খবর নিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'ঢাকার খবরাখবর কী বলতো। খবরের কাগজ পাই একদিন পর পর। গত তিন চার দিন তো পাই-ই নি।'

ঢাকার খবরাখবর যতটা পারে গুছিয়ে বললো কামাল। দাদা বললেন, 'আইয়ুব খান কী খারাপ করেছিলো। গ্রামে-গঞ্জে তো কিছু টাকা পয়সা এসেছে।'

'টাকা পয়সা তো পেয়েছে বিডি মেম্বাররা, ইউনিয়ন কাউন্সিলের মেম্বাররা, গরিবরা পেয়েছে ?' বললো কামাল, 'রাস্তাঘাট হয়েছে কিছু, হ্যাঁ বলতে পারেন মানুষের কিছুটা উপকার হয়েছে, এই তো। এর বদলে কত লোককে জেলে যেতে হয়েছে, অন্যায়ভাবে চাকরি হারাতে হয়েছে, বাঙালিদের অধিকার হারাতে হয়েছে...'

'হ্যাঁ, এই বাঙালি বাঙালি কথাটা আবার নতুনভাবে শুনছি,' বললেন দাদা।

'নতুন না, আগেও শুনেছেন, কিন্তু স্বীকার করতে চাননি,' বলে কামাল।

'ঐ বাঙালি শুনলে হিন্দু হিন্দু লাগে। মুসলমান বললে লাগে না,' ক্ষুব্ধ স্বরে বলেন দাদা, 'হিন্দুদের সঙ্গে তোদের এতো মাখামাখি...'

'আপনি কি আমার বন্ধু সম্পর্কে বলছেন,' রাগ করে কামাল, 'আমার বন্ধুরা আগে মানুষ, তারপর হিন্দু মুসলমান,' বলে কামাল, 'ধর্ম মানে আমরা তাই বুঝি।' আপনারা সেটা বোঝেন না, ঐটে ধর্ম পালন না।'

'শোন ভাই, হিন্দুদের হাতে মার খাও নাই, তাই বুঝতে পারো নাই।' বলে দাদা, 'যাক, তোমার সঙ্গে এসব নিয়ে তর্ক করলে গল্প করবো কখন। আর আমার একমাত্র নাতির সঙ্গে তর্ক করে পারবো নাকি ? নাতি যা বলবে, তাই ঠিক।' হালকা স্বরে বলেন দাদা, 'যাও এখন লম্বা হয়ে ঘুমাও। ওই যে পুবের ঘরে তোমার দাদী বিছানা করে দিয়েছে।'

৬

টিনের ছাদে টুপটাপ শিশির পড়ছে। হ্যারিকেনটা কম করে জ্বালালো। একা একা নতুন জায়গায় একটু গা ছমছম করে। ছোট জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে ম্লান অন্ধকার, কারণ আকাশে ম্লান চাঁদ ঝুলে। মাঝে মাঝে ডাহুক ডেকে উঠছে। বিশাল নিস্তব্ধতার মাঝে হঠাৎ হঠাৎ ডাহুকের ডাকে মন খারাপ হয়ে যায়। কামাল দাদার কথা ভাবে। এক সময় মুসলিম লীগ করতেন। এখন দল করেন না ঠিকই, সহানুভূতি আছে। পাকিস্তান তারা এনেছেন তাই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোনও কিছুই তাদের মনোঃপূত না। নিজেদের অধিকার দাবি করলেও সেটা পাকিস্ত-ানবিরোধী হয়ে যায়।

তরুণরা অধিকার চায় পাকিস্তানের ভেতর, না হলে সে পাকিস্তানে লাভ কী ? আর সেই মুসলমান না বাঙালি, বাঙালি আগে না মুসলমান আগে। গত ১৫০ বছর এই তর্ক ঝালাপালা করে দিচ্ছে। আচ্ছা, আমরা কী ছিলাম, আমাদের শেকড় কোথায় ? হঠাৎ মনে আসে কামালের। আমি কোত্থেকে এই পোড়া দেশে এলাম এ কথা কখনও মনে হয়নি। কেনো ? ভাবে কামাল। আর ভাবতে ভাবতেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছে জানে না।

সকালে ঘুম ভেঙে দেখে চারদিক ঝলমল করছে। হাত-মুখ ধুয়ে কাচারি ঘরে এসে দেখে কাদের আর অনিল অনেক আগেই হাত-মুখ ধুয়ে বসে আছে। নাস্তা এলো। চালের রুটি, ভাজি, মুড়ি, গুড়, তারপর গরম চা।

'এর স্বাদই আলাদা! খেতে খেতে বললো অনিল। কামাল কাজের লোককে জিজ্ঞেস করলো, 'দাদা কোথায় ?' কিছুক্ষণ হলো তিনি বেরিয়েছেন। কী একটা ঝামেলা হয়েছে।

নাস্তা খেয়ে তিনজন বেরুলো গ্রাম দেখতে। আলের ঘাসে শিশির তখনও উবে যায়নি। চারদিকে মাটি, পানি, খড়ের গন্ধ। মাঝে মাঝে দুএকজনের সঙ্গে দেখা হয়। সেই একই প্রশ্ন, 'কি ও, কোন বাড়ি ?' কামাল উত্তর দেয়। ঢাকা থেকে এসেছে শুনে দু'একজন ঢাকার খবর জানতে চায়, বলে 'ঢাকা খুব গরম, খবর পাইছি।' অনেকের সে আগ্রহও নেই।

'ঢাকায় একটা কিছু হচ্ছে, কই এখানের মানুষ তো তেমন উত্তেজিত নয়,' কাদের মন্তব্য করে।

'হয়ত ভাসা ভাসা জানে, যখন পুরোটা জানবে বা নেতারা নাড়াচাড়া শুরু করবেন তখনই দেখবে নাড়াচাড়া শুরু হয়ে গেছে।' বললো অনিল।

'আর গ্রামে নাড়াচাড়া হলে, গদিতে কেউ থাকতে পারবে না।'

কিছুদূর এগোনোর পর দেখে এক জটলা।

উঁকি মেরে দেখে দাদা বসে আছেন এক চেয়ারে। পাশে একটি গরু বাঁধা। সামনে এক হাটুরে লোক বিমর্ষ দাঁড়িয়ে। উত্তেজিত হয়ে লোকজন কথা বলছে। জানা গেলো গরু চুরি করতে এসে এই লোক ধরা পড়েছে। সবাই তাকে পিটিয়ে এক চোট হাতের সুখ করে নিয়েছে। দাদাকে ডাকা হয়েছে, এরপর কী করবে তার পরামর্শ জানতে।

'এই চোর চামুন্ডা, বিডি মেম্বারগুলোর জন্য শান্তিতে ছিলাম না। শালার হাড্ডি ভেঙে দে যাতে আর কোনোদিন চুরি করতে না পারে,' বলে এক লোক লাথি মারে লোকটিকে। হাঁটু ভেঙে পড়ে যায় সে মাটিতে।

‘সব গ্রামে এখন পাহারা,’ জানালো একজন, ‘চোর-ছ্যাচ্চোর ধরার জন্য।’

‘ওকে পুলিশে দেন,’ কামাল জানালো, ‘ও মারা গেলে আপনারা বিপদে পড়বেন।’

‘কিয়ের বিপদ,’ বললো একরোখা একজন, ‘পুলিশ আইলে পুলিশ পিটামো।’

‘নাতি ঠিকই কইছে,’ বলেন দাদা, ‘পুলিশে দাও, আর চারদিকে নজর রাখো।’ বলে উঠলেন দাদা।

উত্তেজনা মিইয়ে গেলো। কয়েকজন লোকটির হাত বেঁধে মাইল দুয়েক দূরে থানার দিকে রওনা দিলো। দাদা ওদের নিয়ে বাড়ির পথ ধরলেন। যেতে যেতে বললেন, ‘আইজ মনে হইলো অবস্থা একটু খারাপ। ঢাকার খবরাখবর আসছে। লোকজন আসছে ঢাকা থেকে। বিডি মেম্বার কয়েকজন নাই।’ পাশের ইউনিয়নের এক বিডি মেম্বারের বাসায় আগুন লাগানো হয়েছে। এ খবর পেয়ে এখানকার বিডি মেম্বাররা পালিয়েছে। দাদা একটু বিমর্ষ।

দাদা বাড়িতে ঢুকলেন। ওরা তিনজন এবার উল্টো পথে খানিকটা এগুলো। সূর্য মাথার ওপর উঠলে ফিরে এলো। কাচারি ঘরে ঢুকতে ঢুকতে কাদের বললো, ‘মনে হয় খবরাখবর সব পৌঁছে যাচ্ছে।’

দুপুরে খেয়ে-দেয়ে ভাত ঘুম দিয়ে যখন ওরা উঠলো তখন সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে। দাদা রাস্তার পাশে আমগাছের নিচে মাচানে বসে আছেন। ক্ষেত থেকে মানুষজন ফিরছে।

‘দাদা, এ রকম গল্পের সময় তো পাওয়া যাবে না। রাজনীতির কচকচানি বাদ দিই। আপনি বরং আমাদের পুরনো দিনের গল্প বলেন,’ মাচানে বসতে বসতে বলে কামাল। অনিল ও কাদেরও বসে একপাশে।

‘বল নাতিরা কী গল্প,’ কথা বলার সুযোগ পেয়ে খুশি হন দাদা।

‘আমি গত রাতে ভাবছিলাম, আমরা কোত্থেকে এলাম। আমাদের পরিচয়টা কী ? এই রোহিতপুরেই আমরা এলাম কীভাবে ?’

‘এটা তো একটু গোলমেলে ব্যাপার ভাই। আমি আমার দাদা পর্যন্ত কাহিনী জানি।’

‘কামালসহ তাহলে পাঁচপুরুষ পর্যন্ত কাহিনী বলতে পারবেন আপনি ?’ কাদের জিজ্ঞেস করে।

'তা ঠিক, তাও আগের কাহিনী তেমন বলতে পারবো না, কারণ তা জানি না।'

'আমাদের কাছে ১০/১২ পুরুষ পর্যন্ত ঠিকুজি আছে,' অনিল জানায়, 'আমাদের মুখস্থ করতে হয়, কিন্তু ঐ যে দাদা বললেন, চারপাঁচ পুরুষ পর্যন্ত হয়তো জানি।'

'আমার দাদার কথা খুব মনে পড়ে না,' বললেন, দাদা, 'আমি যখন খুব ছোট নয়-দশ বছর তখন তিনি মারা যান। তার কাছে শুনেছি এই রোহিতপুর নাকি এক সময় ছিলো নদী। তার দাদার কাছে তিনি শুনেছিলেন। এক সময় নদী মরে যায়, চর পড়ে, আবাদ হয়। আমার দাদা সেই প্রথম আবাদিদের সঙ্গে এসেছিলেন। আমাদের বাড়িটা তখন ছিলো আরও পিছে।'

'আমরা ছিলাম খুব গরিব,' অন্যমনস্ক স্বরে তিনি বলেন, 'দুটি চালা ছিলো আমাদের, ছোট একটি উঠোন। আমার দাদার স্বাস্থ্য ছিলো খুব ভালো। পরনে ধুতির মতো একটা কাপড়। দরকার হলে সেটাই লম্বা করে গায়ে দিতেন। বোধহয় ঐ একটা কাপড়ই ছিলো। আমার বাবা তার এক ছেলে। আমার দু'তিনজন ফুফু ছিলো। অল্প বয়সে বিয়ে হয়। তাদের দেখিনি কখনও বা দেখলেও এতো ছোট ছিলাম যে কিছু মনে পড়ে না। দাদীকে আমি দেখিনি। আমার বাবা আর দাদার অল্প যেটুকু জমি ছিলো তাতেই চাষবাস করতেন। খালি সময়টা কামলা খাটতেন। খাওয়া-দাওয়ার খুব কষ্ট ছিলো রে,' জানালেন দাদা।

কাজের লোক এ সময় এক ধামা মুড়ি আর চার কাপ চা রেখে গেলো। এক মুঠো মুড়ি চিবিয়ে এক চুমুক চা খেয়ে দাদা ফের শুরু করলেন।

'কখনও এক বেলা খেয়েছি। আমার মা'র পরনে বছরে একটা শাড়িই দেখেছি। পুকুরে গোসল করে, পাড়ে দাঁড়িয়ে অর্ধেক শুকাতেন। তারপর বাকিটুকু শুকাতেন,' গলাটা ভারি হয়ে এলো দাদার। 'আমাকে মক্তবে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন বাবা। গ্রামে পাঠশালা ছিলো সেখানে ভর্তি করেননি। দাদা বলতেন পড়াশোনা করে কী হবে ? বাবা বললেন, 'মক্তবে পড়ুক, আমাদের মতো ক্ষেতে কাজ না করে মৌলভী হলেও তো দুটো খেতে পারবে। সম্মান বাড়বে।'

'মক্তবে আমার ভালো লাগতো না। অন্যান্য ছেলেরা, হিন্দুই ছিলো বেশির ভাগ, মাইনর স্কুলে পড়তো। আমিও জেদ ধরলাম স্কুলে পড়বো। বাবা রাজি না, বললেন, নাসারাদের শিক্ষা নিয়ে কী হবে আর খাওয়ার খরচ

নেই তো পড়ার খরচ দেবে কোত্থেকে ? পরে আমার জেদাজেদিতে স্কুলের হেড মৌলবীর সঙ্গে কথা বললেন। তিনি বললেন, তোমার পোলারে নিয়া আমি কইয়া ফ্রি কইরা দিমু, দুই একটা টাকা যা খরচা লাগে আমি দিমু। তো মাইনর স্কুলে ভর্তি হলাম।'

'কিন্তু, আপনার দাদা এসেছিলেন কোত্থেকে ?'

'তা জানি না। উনি বলছিলেন তার দাদা নাকি বলেছিলেন তুরস্ক থেকে তার পূর্বপুরুষরা এখানে আসে। পরে এ দেশের মায়ায় পড়ে যায়। এখানে বিয়ে-শাদি করে থেকে যায়। আমার দাদা পর্যন্ত আসতে আসতে তারা এ দেশের গাঁইয়া হয়ে গেছিলেন। তবে, চেহারা-টেহারা দেখে মনে হয় সত্য হতেও পারে।'

'তখনও কী সবাই ইসলাম ইসলাম করতো, এখনকার মতো।'

'আরে না, কী যে কস,' বলেন দাদা হেসে, 'মুসলমান হয়ত ছিলো কিন্তু নামাজ রোজা জানতো না। হিন্দুদের মতো সাকার পূজা করতো। আমার বাবা শেষ বয়সে ফরাজি হন। তখন শরাশরিয়তের খোঁজ করেন। আমারে সেই কারণেই মাদ্রাসায় দেন। তয় আমি নামাজ পড়াটা শিখেছিলাম। কোরআন পড়া শিখেছিলাম। সেই নামাজ আর কোরআন পড়া ছাড়ি নাই।'

'তাহলে মুসলমান তো বেশি দিন হয় হন নাই।' কামাল ঠাট্টা করে বলে, 'এর আগে তাহলে আপনার বাপ-দাদা কী ছিলো ?'

'সেটা তো ভাবি নাই। হয়ত তোমরা যা বল, বাঙ্গাল আছিল।'

'যাক, দাদা গল্পটা শেষ করেন।'

'মাইনর শেষ হইলে হাইস্কুলে পড়তে চানপুর যাওন লাগব,' তা সেই বন্দোবস্ত হয় কীভাবে ? ওই হেড মৌলবী সবই বন্দোবস্ত করলেন। তখন পাট লাগানোর ধূম। এক পাট ব্যবসায়ীর বাসায় লজিংয়ের বন্দোবস্ত করলেন। সেইখান থেইকাই এন্ট্রান্স পাস করি। তারপর এই গ্রামের স্কুলেই চাকরি পাই।

এই প্রথম পরিবারে চাকরি। নিয়মিত বেতন। সংসারে কয়েকটা টাকা দিতে পারি। অবস্থার একটু উন্নতি হইল। তখন বাবা-মা কইল, বিয়া করতে হইবো। তা আমার শ্বশুর হইলেন ঐ যার বাড়িতে লজিং ছিলাম। তোর দাদী সেই পরিবারের। আমার শ্বশুর খুব খুশি হইছিলেন এন্ট্রান্স পাস জামাই পাইয়া। তা আমারে কইলেন,' স্মৃতি রোমন্থনে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো দাদার মুখ, 'মিয়া, স্কুলের বেতন দিয়া তো সংসার চলবো না। আমার

একজন লেখাপড়া জানা লোক দরকার ব্যবসার জন্য। তুমি আইস, খালি বেতন না লাভের ভাগও পাইবা। তুমি তো আমার ছেলের মতোন।'

সন্ধ্যা নামছে। মাগরেবের আজান শোনা গেলো পাশের মসজিদ থেকে। দাদা বললেন, 'নামাজ পইড়া আহি, তারপর কমু। তোমরা তো আর নামাজ পড়বা না, কিন্তু এক আধটু পড়লেই পারো।'

দাদা নামাজ পড়তে গেলেন। তারা তিনজন অন্ধকারে মাচানে বসে রইলো। কামাল বললো, 'আমাদের পরিবারগুলোর ইতিহাস দেখলে বোঝা যেতো আমরা কী ছিলাম, কী হয়েছি। মিলিকে আনলে হতো, ইতিহাসে আগ্রহী। একটা বই লিখে ফেলতে পারতো ইতিহাসের।'

'আরে গবেট,' বললো কাদের, 'মিলিকে আনতে হলে তো একবারে আনতে হবে। ওই প্ল্যান কি করেছিস নাকি?' কাদের ও অনিল দুজনে হো হো করে হেসে ফেলে। ভারি অপ্রস্তুত হয় কামাল, 'আরে না, তোরা সবটাতেই ঠাট্টা করিস। এই জানার ব্যাপারটা, শেকড় খোঁজার ব্যাপারটা সিরিয়াস ব্যাপার।

দাদা নামাজ সেরে এসে বসেন। বহুদিন পর ভালো শ্রোতা পেয়ে তাকে গল্পের মুড এনে দিয়েছে। যুৎ করে বসে বললেন, 'শোন, শ্বশুর আব্বা বলার পরপরই চাকরি ছাড়ি নাই, একটা প্রেসটিজ আছে না,' হাসলেন দাদা, 'পরে বুঝলাম, কিছু টাকা-পয়সা না হইলে সম্মান নাই।'

'তা কাজ শুরু করলাম। দুই এক টাকা করে আসতে লাগলো। এরই মধ্যে আব্বা মারা গেলেন। নাতির মুখ মানে তোর আব্বার মুখ দেখতে পারেননি। মা তারপর আরও বছর তিনেক বেঁচেছিলেন। এর মধ্যে জমিজমা কিনে এই বাড়িঘর করেছি। এখানেই থাকা শুরু করলাম। সপ্তাহে দুই দিন চানপুর যাইতাম। আমার শ্বশুর মারা যাওয়ার পর ঐ সব ছাইড়া জমিজমা দেখি। আফসোস বাপ-মা বাড়িঘর দেইখা যাইতে পারলেন না।'

'আমার ব্যাপারে তোর দাদা যেই ভুল করছিলো আমি আর সেটা করি নাই। আমার ছেলেরে মানে তোর বাপরে একেবারে ভার্সিটি পর্যন্ত পড়াইছি। এইটা বুঝেছিলাম, পড়ালেখা না শিখাইলে উন্নতি নাই।'

'এটা যদি আগে আমাদের লোকজন বুঝতো, তাহলে হয়ত আমরা আরও আগে উন্নতি করতে পারতাম। পাকিস্তান হয়ত দরকার পড়তো না।' বলে কামাল।

তাহলে কী মানুষ আগে, না ধর্ম আগে?

পাকিস্তান আমাদের দরকার ছিলো। আমাদের ওপর হিন্দুরা যে অত্যাচার করেছে তার ইয়ত্তা নেই। আমরা মুসলিম লীগ করছি, কানমে বিড়ি মু'মে, পান লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান স্লোগান দিয়ে পাকিস্তান কায়েম করেছি। পাকিস্তান হইছিলো দেইখ্যা তোর বাপ এমএ পাস করছে। চাকরি পাইছে, তোরা ভালো অবস্থায় আছিস। সুতরাং, আমি পাকিস্তান চাইলে দোষ কী ?'

'আচ্ছা দাদা, আপনাদের গ্রামে হিন্দু চাষীরা ছিলো না ?' অনিল এই প্রথম কথা বলে, 'হিন্দু ভদ্রলোকরা কি তাদের খুব খাতির যত্ন করতো ?'

'না, তা করতো না। তাদের অবস্থা ছিলো আমাদের মতো।'

'দাদা', কামাল বলে, 'শুনছি এই গ্রামে ছিলো মুসলমান জোতদার। তার বাড়ির সামনে নাকি ছাতি মাথায় দিয়া যাওয়া যাইত না ?'

'ঠিক।'

'তাহলে দাদা, ব্যাপারটা তো সমান। মুসলমান হয়েও তো বড় লোক মুসলমান গরিবের ওপর অত্যাচার করে। হিন্দু বড়লোকরাও করে। হিন্দু-মুসলমান আলাদা কোনও ব্যাপার তো না।'

'যুক্তিটা হয়তো ঠিক,' বললেন দাদা, 'কিন্তু পাকিস্তান আমাদের দরকার ছিলো। পাকিস্তান না হইলে আমাদের দিশা থাকতো না।'

'থাক এসব তর্ক-বিতর্ক। চল দাদা, ভেতরে যাই খাওয়া-দাওয়া করি।' আর অনিল মনে মনে ভাবে, পাকিস্তান হওয়ার আগে মুসলমানরা যে রকম ছিলো পাকিস্তান হওয়ার পর হিন্দুদেরও সেই অবস্থা হয়ে গেলো। তাহলে কী মানুষ আগে, না ধর্ম আগে ? তারা তো ইন্ডিয়া যায় নাই, এটাই তাদের দেশ মনে করে, তাহলে সবাই তাদের বাঁকা চোখে দেখে কেনো ?

চ

কয়েকদিন গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ালো ওরা। সকালে বেরিয়ে যেত, এদিক সেদিক ঘুরতো। আলে বসে চাষীদের সঙ্গে গল্প করতো। কামাল একটি জিনিস লক্ষ্য করেছে, ঢাকায় কী হচ্ছে না হচ্ছে সে সম্পর্কে আগ্রহ দেখাচ্ছে গ্রামের মানুষজন। অর্থাৎ ঢাকা থেকে অনেকে গ্রামে আসছেন, খবরাখবর জানা যাচ্ছে, অনেকের বাড়িতে ট্রানজিস্টর আছে। খবরাখবর জানার পর

তাদের মনোভাব পাল্টাচ্ছে। না হলে, অনেক বিডি মেম্বার বা মুসলিম লীগের পাতি নেতারা এলাকা থেকে গা-ঢাকা দিয়ে আছে কেনো।

'বোর হয়ে গেলাম রে,' কাদের একদিন পুকুরে জাল ফেলা দেখতে দেখতে বলে।

'সবই ভালো, শরীর স্বাস্থ্যও ভালো লাগছে। কিন্তু সব ডাল,' যোগ করে অনিল।

'শহুরে লোক তো আমরা। গ্রাম সম্পর্কে ভাবি, বক্তৃতা দিই কিন্তু গ্রামে থাকতে চাই না,' ঠাট্টার সুরে বলে কামাল।

'কিন্তু এই লোকগুলো বছরের পর বছর এখানে থাকছে কীভাবে ?'

'আসলে অন্যদিক থেকে দেখ। শহরে আমরা ব্যস্ত থাকি, এখানে তারা ব্যস্ত। তোর দাদাকে শহরে নিয়ে যা তো দেখি। ছেলে-নাতি সব থাকলেও দেখবি এক সপ্তাহ পর পালাই পালাই করছেন।'

এরই মধ্যে একদিন চার-পাঁচ দিনের কাগজ এলো। দুপুরের খাবারের পর একেক জন কাগজ নিয়ে বসলো। বিকেল পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব পড়লো।

'কী রে গরম খবর তো কিছু দেখছি না,' বিকেলে সেই মাচানে বসে চা খেতে খেতে বললো কামাল।

'আসলে ঢাকায় থেকে প্রতিদিন মিছিল আর গুলি দেখে, গুলি আর মিছিলের খবর না থাকলে মনে হয় ইম্পর্ট্যান্ট খবর নেই,' বলে কাদের, 'কিন্তু সিগনিফিকেন্ট খবর আছে কিছু।'

'কী সব সিগনিফিকেন্ট খবর বাছা, বলতো', বলে কামাল।

'প্রথম আইয়ুব খান আলোচনা করতে চাচ্ছেন,' বলে কাদের, 'ভেবে দেখ পাকিস্তানের লৌহমানব খানের খান আইয়ুব খান ভেতো বাঙালিদের সঙ্গে আলোচনা করতে চান, অর্থাৎ পাকিস্তানের সব খবর ভালো নয়, দুই. এখন শুধু ঢাকায় নয়, সারা দেশের এখানে সেখানে বিক্ষোভ মিছিল হচ্ছে, চোর-চামুণ্ডাদের ধরা হচ্ছে, তিন. বিডি মেম্বারদের অনেকে শুধু পলায়ন নয়, পদত্যাগ করছে, সুতরাং, সবই ঠিকমতো এগোচ্ছে।'

'আরেকটা ভালো খবর আছে।' যোগ করে অনিল, 'এই দেখ পত্রিকায় কী লিখেছে—'ছাত্রদের ১১ দফার প্রশ্নে কোন আপস নাই। আলোচনা হলে এখন ১১ দফা নিয়ে আলোচনা করতে হবে।'

আলোচনা চলে, সন্ধ্যা নামে। তারা বসে থাকে। আকাশটা তারায় ভরা। ঘেরা ঘর থেকে বাইরে বসে তারার মেলার দিকে তাকিয়ে থাকতেও

ভালো লাগে। দাদা নামাজ পড়ে ঘরে ফেরার সময় তিন মূর্তিকে বসে থাকতে দেখে দাঁড়ালেন। 'কী নাতিরা কলকাকলি যে নেই। ও খবরের কাগজগুলো দাও তো। কোনো খবর আছে ?'

'আছে দাদা, আমরা যা চাচ্ছি, সে দিকেই যাচ্ছে।'

'তার মানে পাকিস্তানে একটা গন্ডগোল না কইরা তোমরা ছাড়বা না। ছিলাম নাসারাদের আন্ডারে। এখন মুসলমানদের আন্ডারে থাকা বুঝি আর ভালো লাগছে না। তোমাদের ঠিক বুঝতে পারি না।'

'দাদা, বসে থেকে থেকে বোর হয়ে যাচ্ছি,' কামাল অন্যদিকে কথা ঘোরাবার জন্য বলে, 'ভাবছি দু'একদিনের মধ্যে কেটে পড়বো।'

'আরে এতো তাড়াতাড়ি কই যাবি ?' ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, বুঝছি, প্রতি মিনিটে খবর না হলে ভালো লাগে না। 'আচ্ছা, দেখি ব্যবস্থা করা যায় কি না।'

কিছুক্ষণ পর তিনি আবার ফিরে এলেন। হাতে একটা ট্রানজিস্টর। বললেন কামালকে, 'তোর বাবা দিছিল খবরাখবর শোনার জন্য। খবর শোনার সময় কই। মনেই থাকে না, পড়ে আছিল।'

ট্রানজিস্টরটা ভালোই, ব্যাটারি নেই। গ্রামের মুদি দোকানে খোঁজ করে ব্যাটারি পেলো।

এবার প্রতি মিনিটেই খবর পাওয়া যাবে।

পরদিন সকালের খবরেই শোনে আইয়ুব খান ঢাকায় চলে এসেছেন। ঘোষণা করেছেন, জরুরি আইন প্রত্যাহার করবেন। ১৪৪ ধারা জারি করা হবে না ইত্যাদি। তিনি বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতেও চান। রাতে খেতে খেতে কাদের বললো, 'আইয়ুব খান ঢাকায়, আর আমরা এখানে কেনো। এখনই ঢাকায় ফিরতে হবে।'

'জরুরি আইন না থাকলে, সেনাবাহিনী না থাকলে এখন জমবে ভালো,' বলে অনিল, 'গুলি-গোলাও হয়ত বন্ধ হবে। আর ক্লাস ভালোভাবে শুরু করার আগে একটু বাড়িও যেতে হবে।'

কামাল দাদাকে রাতেই জানায়, আগামীকাল তারা যেতে চায়। দাদা রাজি নন। এতদিন পরে এলে, এখনও তো ভালো করে খাওয়ানোই হয়নি। দাদী বললেন, 'আগামীকাল থেকে যা পোলাও কোরমা রান্না করি। ছেলেগুলো নিয়ে আসছস ক্যামন দেখায়।'

ঠিক হলো, পরশু সকালে তারা চলে যাবে। দুপুরে গ্র্যান্ড খাওয়া। তারপর নিশ্চিত ঘুম। বিকেলে মাচানে এসে দেখে দাদা আগেই বসে আছেন। কামালকে বলেন,

'কামাল, ফ্যামিলি হিস্ট্রি তো জানলা। এখন আমার সঙ্গে আস বাপ-দাদার কবর দেখাইয়া আনি। এক সময় তো তোমাকেই সব দেখাশোনা করতে হবে।'

তাদের মূল বাড়ি পেরিয়ে পেছন দিকে গোরস্তান। ছোটো, বোঝা যায় খুব পুরনো। দাদা তার দাদা-দাদী, বাবা-মা'র কবর দেখান। তারা কবর জেয়ারত করে। অনিলও মুনাজাতে অংশ নেয়। দাদা ফিরতে ফিরতে বলেন, 'নদী হয়ত এদিকে আসবে না, কবরগুলো বেঁচে যাবে। হয়ত তোমার ছেলেমেয়েরা সাত আট পুরুষের খবর জানতে পারবে। নদীই আমাদের শেকড় বারবার ছিঁড়ে ফেলে।'

রাতে ঘুমোবার সময় দাদার এই শেকড় ছিঁড়ে ফেলার কথাটা কামালের বারবার মনে হয়। এ দেশে কত মানুষ এসেছে নানা দেশ থেকে। থেকে গেছে। ধর্ম বদলেছে তবুও অনেক কিছু এক রয়ে গেছে, যেটাকে বলা যায় বাঙাল সংস্কৃতি। এটা পাল্টাবে কীভাবে ? তার দাদা পাকিস্তান চেয়েছিলেন কেন, ভাবে কামাল, বড়লোক হবেন বলে ? তার বাবাও তো এক সময় পাকিস্তান পাকিস্তান করেছেন। এখন কেন করেন না ? তার ন্যায্য প্রমোশন হয়নি বলে। তারা কেন এখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত ? দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশই তাদের পাওনা পায়নি দেখে ক্ষিপ্ত।

কামাল আরও ভাবে, কতদূর থেকে তার পূর্বপুরুষ এসেছে, যদি গল্পটা সত্য হয়, তারপর থেকে গেছে। হয়তো যেখানে তারা ছিলো সেখান থেকে এদেশ ভালো ছিলো। থাকতে থাকতে কামালরা সব খাঁটি বাঙাল হয়ে গেছে। এখানের যা রীতিনীতি তাই তো মানবে। ইসলামের নামে আরবি, উর্দু চালানোর চেষ্টা, রবীন্দ্রসঙ্গীত বন্ধ করা, এখানকার মানুষের হাফ মুসলমান বলা এগুলো কী ধরনের ব্যাপার। এসব যতই ভাবে ততই উত্তেজিত হয়ে ওঠে কামাল। মুসলমান মুসলমান ভাই হলে তাদের চাকরের মতো দেখা হয় কেনো।

পরদিন ফজরের নামাজের পরপরই দাদা তাদের উঠিয়ে দিলেন। তাড়াতাড়ি রওনা হলে আরামে পৌঁছে যাবে। চা'টা খেয়েই তারা রেডি হয়ে যায়। দাদীও ঘোমটা দিয়ে মাচানের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। তারা তিনজনই তাদের কদমবুসি করে। দাদা বলেন, 'নাতিরা আমার কথায় কিছু

মনে করো না। বুড়ো মানুষ অনেক কিছু বলে ফেলি। আমরা আবার খুশি হবো যদি তোমরা আরও বন্ধুবান্ধব নিয়ে আস। এটাই দেশ, এর কাছে শেকড় না থাকলে উদ্বাস্তু হয়ে যাবে।'

'আমাদের সবার জন্য দোয়া করেন। যা অবস্থা কে থাকি, কে না থাকি বলা যায় না।'

'আহ কামাল,' দাদী এবার মুখ খোলেন, 'যাওয়ার আগে এসব বলতে নাই।'

বিদায় নিয়ে তারা হাঁটতে থাকে। দাদা-দাদী চেয়ে থাকেন। দাদা এক সময় আপন মনে বলেন, 'এ ভাবেই বোধ হয় বংশ বেঁচে থাকে। একজন থেকে আরেকজন।'

ছ

ঢাকা ফিরতে ফিরতে কামাল ভেবেছিলো প্রেসিডেন্ট এসেছেন, হয়তো আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ঝামেলা দূর হবে। আগের জীবনে ফিরে যাবে। দেখা গেলো, ব্যাপারটা তেমন সহজ নয়। আইয়ুব খানের কথা মানতে কেউ রাজি না। আইয়ুব খান থাকতে থাকতেই প্রায় প্রতিদিন শুধু মিছিল হয়। ৯ ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের শপথ দিবসে পল্টনে লোকে-লোকারণ্য। মনে হয় ঢাকা শহরের সব লোকজনই ছিলো সেখানে। এরপর জেল থেকে সব নেতাদের মুক্তি দেয়া হতে থাকে। কামালের অনেকবার মনে হয়েছে, বিরোধিতা করলেই মিথ্যা মামলা দিয়ে কেন জেলে পুরতে হবে ? এ কাজটি তো পৃথিবীর কোথাও হয় না। ইংরেজরা এটা শুরু করলো, তাদের থেকে পাকিস্তানিরা নিয়েছে।

ঢাকায় ফিরে মালপত্র বাসায় রেখেই কামাল বেরিয়ে পড়েছিলো বন্ধুদের খোঁজে। সবার ধারণা আবারও জানুয়ারির মতো অবস্থা হবে। রাতে যখন কামাল ফিরেছে, গেট খুলে দেখে দোলা পায়চারি করছে উঠোনে। কামালকে দেখেই এগিয়ে এলো, বললো,

'কী রে এতদিন পর এলি একবার দেখাও করলি না।'

'আসলে মালপত্র রেখেই বেরিয়ে গেছিলাম,' অপরাধীর সুরে বললো কামাল। তারপর কী মনে করে বললো, 'এখনই তো যাচ্ছিলাম দেখা করতে, ভালোই হলো, দেখা হয়ে গেলো।'

'প্রথম মাসে দোলাকে একটা ভালো লং প্লেয়িং রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড কিনে দেবে।'

'দেখ। মিথ্যা বলবি না, রাগ রাগ গলায় বললো দোলা,' 'আমি তোর জন্য কত ভাবি তুই জানিস ?'

'আচ্ছা ভাবিস কেন ?' নিরুপায় গলায় বললো কামাল।

'সেটা যদি বুঝতি তাহলে তো আর গর্দভ থাকতি না।' বলে দোলা রওনা হলো বাড়ির দিকে। কামাল পিছু পিছু হাঁটতে লাগলো। সিঁড়ির কাছে ফিরে দোলা বললো, 'এরপর রাস্তায় গেলে আমাকে নিয়ে যাবি।'

কামাল নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ে।

তা, কামাল কী আর দোলাকে নিয়ে বের হয়। তার নিজের ঠিকঠিকানা নেই। কলাভবনের দিকে বেরিয়ে হয়তো পৌঁছে যায় মতিঝিল। শহরের যা অবস্থা। বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস টেলাশের বালাই নেই। অনেকে ঢাকা ছেড়ে

চলে গেছে। অনিলও বাড়ি গেছে দু'একদিনের জন্য। কাদেরের সঙ্গে মাঝে-মাঝে দেখা হয়। সে মহাব্যস্ত।

এরই মধ্যে একদিন কামাল আজাদ অফিসে যায়। তার শেষ রিপোর্ট বের হওয়ার পর দু'সপ্তাহ অফিসে যায়নি, ভেবেছিলো যথার্থ কারণেই তার একটা বকুনি পাওনা। কিন্তু অফিসে পৌঁছে নিউজ এডিটরের সঙ্গে দেখা হতেই বকুনির বদলে একগাল হাসি হেসে বললেন,

'কী কামাল, বাইরে ছিলে নাকি! শোন তোমার রিপোর্টগুলো এডিটর সাহেবের খুব পছন্দ হয়েছে। এখন থেকে নিয়মিত রিপোর্ট লিখবে। তোমাকে প্রতিমাসে নিয়মিত কিছু টাকা দেওয়া হবে। কী খুশি তো!'

খুশি আবার না। এক. তার লেখার স্বীকৃতি পাচ্ছে, দুই. নিয়মিত বেতন, আম্মার কাছে হাত পাততে হবে না। টাকা জমিয়ে কয়েক মাসের মধ্যে একটা সাইকেল কিনতে পারবে। সাইকেলটা খুব দরকার। মাঝে-মাঝে বইটইও কেনা যাবে। 'তবে', ভাবে কামাল, 'প্রথম মাসে দোলাকে একটা ভালো লং প্লেয়িং রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড কিনে দেবে।' মেয়েটিকে কোনোদিন কোনও উপহার কিনে দেয়নি সে।

এদিকে 'ডাকে'র একটি অংশ নুরুল আমীন, ফরিদ আহমেদ প্রমুখ আপসের পক্ষে। আইয়ুব খান আলোচনা করতে চাচ্ছেন খারাপ কী। আওয়ামী লীগ রাজি না। আগে শেখ মুজিবের মুক্তি তারপর অন্য কথা। ডাকের অনেকে তা মানতে রাজি নয়। তারপরও সারা পাকিস্তানে ১৪ ফেব্রুয়ারি ডাকা হয় হরতাল।

সেই ১৪ ফেব্রুয়ারি আর তারপরের এক সপ্তাহের কথা কামাল ভুলবে না। হরতালের দিন সকাল সকাল বেরুবে সে। কাদেরের সঙ্গে কয়েকদিন দেখা নেই। সকালে কাদেরকে ধরবে বাসায়। নাস্তার টেবিলে তখনও রহিম সাহেবকে বসে থাকতে দেখে অবাক হয় সে।

'আব্বা, শরীর খারাপ, অফিস নেই ?' কামাল জিজ্ঞেস করে।

'আছে যাবো না।' কামাল একটু অবাক হয়। হক চাচা এ কথা বললে হয়তো একটু কম অবাক হতো।

নিচে বেরুবার পথে দেখে বারান্দায় বসে আয়েস করে হক চাচা পত্রিকা পড়ছেন। 'কী চাচা, আপনিও দেখছি হরতালের পক্ষে।' কামাল বলে।

'হ্যাঁ,' মুখের সামনে থেকে কাগজ সরিয়ে হাসিমুখে বলেন, 'সারা দেশ আজ হরতালের পক্ষে।'

মহল্লায় দেখে এরই মধ্যে মিছিল বেরিয়ে গেছে। সাধারণত হরতালের দিন মহল্লা নীরব থাকে। কাদেরের বাসার সামনে পৌঁছে দেখে কাদের বেরুচ্ছে। দু'জন হাঁটতে থাকে, প্রেসক্লাবের সামনে উঠবে। কাদেরের মহল্লায়ও মিছিল। হরতালের দিন দু-একটি মুদি দোকান খোলা থাকে। আজ সব দোকান বন্ধ। প্রেসক্লাবের সামনে, পাশে মিছিল। সচিবালয়ের সামনে একদল ছাত্র শুয়ে আছে। তাদের ডিঙিয়ে অনেকে অফিসে যেতে রাজি নয়। বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। অনেকে অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে। রাস্তায় সাদা রঙ দিয়ে দুটি ছেলে লিখছে। যতই বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে এগুচ্ছে ততই মিছিলের দেখা পাচ্ছে। মিছিল থেকে স্লোগান উঠছে, মিছিলগুলোর লক্ষ্য নেই, আপনমনে ঘুরছে। আশপাশে পুলিশ আছে তবে নীরবে সব দেখছে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় তো মিছিল থাকবেই। টিএসসির মোড়ে ইচ্ছে করেই কিছুক্ষণ দাঁড়ালো কামাল, যদি মিলির দেখা মেলে। অনেকদিন মিলির সঙ্গে দেখা হয়নি। এলাকাটি মিছিলে মিছিলে সয়লাব। কাউকে খুঁজে বের করা মুশকিল। ইউনিভার্সিটির চারপাশ ঘুরে দুপুরে মধুর ক্যান্টিনে চা-শিঙ্গাড়া খেয়ে নিলো ওরা দুজন। বাসায় যাবে না। এখান থেকে সোজা পল্টনের জনসভায়।

দুপুরের পর একটা মিছিলের পিছু পিছু পল্টনের দিকে রওনা হয় দুজন। মিছিলেই জানতে পারলো, একদল ছাত্র-জনতা মোহাম্মদপুরে ঢোকার পথে আইয়ুব গেটে কালো রঙ দিয়ে বড় বড় করে লিখে দিয়েছে আসাদ গেট। তারা ঘোষণা করেছে আজ থেকে আইয়ুব গেট হলো আসাদ গেট আর আইয়ুব নগরী বা সেকেন্ড ক্যাপিটাল হলো শেরে বাংলা নগর। মনটা খুশি হয়ে গেলো।

'আমাদের সংগ্রাম—চলছে চলবে,' 'আপস না সংগ্রাম, সংগ্রাম'। স্লোগান থেকে মিছিল উঠছে। কার্জন হলের মোড় থেকে যতদূর দেখা যায় তোপখানা রোডের প্রায় সবটাই মানুষে ভরা। মিছিলে মিছিলে একাকার। স্লোগান উঠছে চলো চলো পল্টন চলো, পল্টন চলো, ফুর্তিতে সবাই সাড়া দিচ্ছে।

পল্টনের ধার পর্যন্ত পৌঁছালো তারা। বক্তৃতা শুরু হয়ে গেছে 'ডাক' নেতাদের। শুনতে চাচ্ছে না কেউ। খালি স্লোগান, 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই, আগরতলা ষড়যন্ত্র মানি না। গোলটেবিল না রাজপথ-রাজপথ রাজপথ।' কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন আপসকামী নেতারা। এরপর ছাত্রনেতারা বক্তৃতা করলেন। এবার সবাই শান্ত। ন্যাপের মোজাফফর

আহমেদ বলছিলেন, গোলটেবিল বৈঠক জনতার বিজয়, সবাই হইচই করে ওঠে। তিনি তাড়াতাড়ি বক্তৃতা শেষ করেন। তারপর ওঠেন সদ্য ছাড়া পাওয়া আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ। কামাল আগে কখনও তাজউদ্দীনকে দেখেনি। বুড়ো আঙুলের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে দেখার চেষ্টা করে, বৃথা। তাজউদ্দীন বললেন, শেখ মুজিব ছাড়া কোনও আলোচনা হবে না। প্রবল হাততালি। জনতা এবার খুশি হয়ে স্লোগান দেয়—'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা মানি না, মানি না।'

সন্ধ্যায় বাদাম খেতে খেতে ঘরে ফেরার সময় কামাল জিজ্ঞেস করে, 'কত লোক হবে আন্দাজ।'

'লাখ দুই তিন তো বটেই' উত্তর দেয় কামাল।

ঘরে ফিরে কামাল হাতমুখ ধুয়ে চা খেয়ে রহিম সাহেবকে দিনের ঘটনা শোনাচ্ছে, এমন সময় দরজায় অসহিষ্ণু কড়া নাড়ার শব্দ। দরজা খুলে দেখে কাদের।

'সার্জেন্ট জহুরুল হককে মেরে ফেলেছে।' হাঁফাতে হাঁফাতে বলে কাদের। কামাল প্রথমে বুঝতে পারে না। কাদেরের গলার আওয়াজ শুনে বেরিয়ে এসেছেন কামালের বাবা-মা।

'আগরতলা মামলার আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক। সৈন্যরা তাকে গুলি করে মেরে ফেলেছে। চল।'

'আব্বা আমি যাচ্ছি,' কামাল সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়ায়, 'আজ হলে থাকব, চিন্তা করো না।'

'কামাল শুনে যা,' মার চিৎকারও কানে যায় না, দুজনে টপকে টপকে সিঁড়ি ভাঙে। রাস্তায় এই অন্ধকারেও মিছিল নেমে গেছে। ফুটপাতে উত্তেজিত গলা। 'তিনজন মারা গেছে, না দুইজন'।

কামাল আর কাদের প্রায় দৌড়ে হলে আসে। জাহিদের রুমেও কয়েকজন। খবর জানা গেলো, সার্জেন্ট জহুরুল হকসহ তিনজনকে গুলি করা হয়েছে। আরেকজন ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক ও মজিবর রহমান গুলি খেয়ে মরণাপন্ন, হাসপাতালে। জহুরুল হকের লাশ আনা হবে তাঁর বাড়িতে।

'জাহিদ তোর এখানে থাকব দুজন। কাল লাশ দেখে ফিরবো।'

'হ্যাঁ। আমি খবর নিয়েছি, এই এলিফ্যান্ট রোডে তাঁর ছোট ভাই অ্যাডভোকেট আমিনুল হকের বাসা। লাশ সেখানে আসবে। আগামীকাল আবার মওলানার মিটিং আছে।'

রাত ১১/১২ পর্যন্ত মিছিল স্লোগান চলে। মহসিন হলের বারান্দা থেকে শোনা যায়। ক্যান্টিনে খেয়ে তারা রাত জেগে গল্প করে।

সকাল ৯টা সাড়ে ৯টার দিকে ওরা তিনজন বেরুলো। এলিফ্যান্ট রোড থেকে একটা গলি ভেতরের দিকে গেছে। সেখানে আমিনুল হকের বাসা। সামনে উঠোনে খাটিয়ায় জহুরুল হকের লাশ। তখনও ভিড় কমেনি। কামাল বললো, 'দেখ, মুখটা কেমন শান্ত'। একটু পরে মওলানা ভাসানী এলেন। কিছুক্ষণ লাশের সামনে দাঁড়ালেন। তারপর আমিনুল হকের সঙ্গে কথা বললেন। জানা গেলো পল্টনে তার সভায় গায়েবানা জানাজা হবে।

রাস্তাঘাটে ভিড় আছে তবে একটা থমথমে ভাব। কামাল বললো, 'কাদের বাসায় চলো। সেখান থেকে খেয়ে-দেয়ে পল্টন যাবো।' একটা রিকশা নেয় ওরা দু'জন। কাদেরকে প্রেসক্লাবের সামনে নামিয়ে বাসায় ফেরে কামাল।

দোলা কলেজ যায়নি। কলেজ হয়নি। শুধু শুধু গিয়ে লাভ কী। বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলো। কামালকে দেখে বললো, 'কামাল তুই কথা রাখিস নি।'

কামাল বলে, 'আচ্ছা পাগল তো তুই। রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখেছিস, কখন কী হয়। তারপর যখন তখন হরতাল, গন্ডগোল, রিকশা পাওয়া যায় না। কতটা হাঁটতে পারবি তুই ?'

দোলা কথা বলে না।

'শোন ২১ ফেব্রুয়ারি আমরা দু'জনে সকালে শহীদ মিনারে যাবো। কী খুশি ? হাস তো এবার।'

দোলা বলে, 'ঠিক।'

'ঠিক। প্রমিজ।'

মওলানা ভাসানীর জনসভায়ও মানুষজন কম হয়নি। ফুটপাতে বাদাম কেনার সময় জাহিদের সঙ্গে দেখা। সভা চলছে, ওরা বাদাম খেতে খেতে দেখে মিছিল সব আসছে। স্লোগান একই। লাল আর কালো পতাকা হাতে মিছিল, সব যাচ্ছে পল্টনের দিকে। যাত্রাবাড়ী থেকে শ্রমিকদের একটি বড় মিছিল আসছে। হয়ত আদমজী থেকে। পল্টনে ঢোকার মুখে ভরাট গলায় একজন স্লোগান তুললো, 'জাগো জাগো বাঙালি জাগো।' মিছিলের মানুষজন একটু থমকে গেলো। নতুন স্লোগান। সেই গলা। এবার মিছিলের সব মানুষ ভরাট গলায় বলে উঠলো 'জাগো জাগো বাঙালি জাগো'। নতুন এই স্লোগান আশপাশের মিছিলগুলোতে অনুরণিত হতে লাগলো।

'জাহিদ, মিছিলের স্লোগানটা কেমন বদলে গেলো।'

'হ্যাঁ, আমার মনে হয়, আজ থেকেই সব কিছু অন্যদিকে মোড় নেবে। সাধারণ মানুষ যখন নিজেরাই বাঙালিকে জাগানোর স্লোগান দিচ্ছে তখন নেতাদের আর পাকিস্তান পাকিস্তান করার উপায় নেই।'

এদিকে জনসভার চারপাশ থেকে শুধু শেখ মুজিবের মুক্তির স্লোগান। পিকিংপন্থি ভাসানী ন্যাপের সভা। সেখানে শুধু মুজিব মুজিব, সঙ্গের নেতারা বিব্রত। বোঝা যাচ্ছে মানুষের আর কোনো কিছু শোনার ধৈর্য নেই। ভাসানী অভিজ্ঞ লোক। মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন বক্তৃতার জন্য। আন্দোলন সম্পর্কে জ্বালাময়ী কিছু কথা বলে ঘোষণা করেন—

"আমার এককালের সংগ্রামের সাথী শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল দেশপ্রেমিককে যদি অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া না হয় তবে এ দেশে ফরাসি বিপ্লবের পুনরাবৃত্তি ঘটবে। কারা প্রাচীর ভেঙে পড়বে'...অন্যদিকে জহুরের লাশ নিয়ে মিছিল শুরু হয়েছে। ভাসানী শেষ করলেন—"আইয়ুব যদি আপসে মুক্তি না দেয় তাহলে শেখ মুজিবকে ক্যান্টনমেন্ট ভেঙে বের করে নিয়ে এসো।" জনতা সঙ্গে সঙ্গে স্লোগান দেয় 'চলো চলো ক্যান্টনমেন্ট চলো।'

'অবস্থা তো সুবিধার নয়,' কামাল বলে জাহিদকে।

'চারদিকে লোক, মিছিল, কেউ কারও কথা শুনছে বলে তো মনে হয় না।'

জাহিদ আর কামাল ভিড় ঠেলে বেরিয়ে ফুটপাতের ভিড়ে দাঁড়ায়। হঠাৎ দূরে গুলির শব্দ শোনা যায়। ব্যাপারটা কেউ বুঝতে পারেনি। কিন্তু মিনিট পাঁচেকের মধ্যে জনে-জনে খবর পৌঁছে যায় শোক মিছিলে গুলি হয়েছে। মারা গেছে একজন। মিটিং ভেঙে যায় আর কী। ভাসানীর কাছেও এ খবর পৌঁছে। সঙ্গে সঙ্গে শহীদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে সভা শেষ করে মিছিলের নির্দেশ দেন। নিজে এসে দাঁড়ান মিছি ার সামনে। কিছুক্ষণ পর মওলানা সরে দাঁড়ান। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো এগিয়ে চলে মিছিল। এই চলতে চলতেই জানা যায় আবদুল গনি রোডের সামনে মন্ত্রী সুলতান আহমদের বাসার সামনে পুলিশের গুলিতে মারা গেছে একজন, আহত হয়েছে তিনজন। লোকজন ছুটতে থাকে। বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো মানুষ আসতে দেখে পুলিশরা পালায়। জনতা আগুন ধরিয়ে দেয় মন্ত্রীর বাসায়।

তারপর একঘণ্টা যে কী হলো তার বিবরণ কামাল দিতে পারবে না। সে নিজেও যেন উন্মত্ত হয়ে গিয়েছিলো। সে আর জাহিদ মিছিলের পেছনে ছুটছিলো।

আবদুল গণি রোড দিয়ে উন্মত্ত জনতা ছুটে এলো কার্জন হলের মোড়ে। কে একজন বললো, 'এই তো বিচারপতির বাড়ি।' কার্জন হলের উল্টোদিকে সেই ইংরেজ আমলে করা লাল দোতলা। আগরতলা মামলার বিচারপতি পশ্চিমা এসএ রহমান থাকেন। বাড়ি ঘিরে ফেলা হলো। একজন কোত্থেকে এক টিন কেরোসিন এনে ছিটিয়ে দিলো। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালালো আরেকজন। চিৎকার করে উঠলো, 'হারামজাদা বিচারকের বাচ্চা বিচার করতে আইছে। শালারে শিক্ষা দে।'

সাহসী দু'একজন ঢুকে পড়লো বাড়ির অন্যদিক দিয়ে। এর মধ্যে কামাল, জাহিদও আছে। বিচারককে খুঁজছে। নেই কোথাও। একজন বললো, 'শালা পালাইছে।'

আরেক দল রমনা দিয়ে শাহবাগ পৌঁছেছে। আগুন দিয়েছে খাজা শাহাবুদ্দীনের বাসায়, যিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ করেছিলেন। মুসলিম লীগের সভাপতি খাজা হাসান আসকারীর বাসায়ও আগুন দেওয়া হলো। একেকটি বাড়িতে আগুন দেওয়া হয় আর উল্লাসে সবাই ফেটে পড়ে। কামাল, জাহিদ ততক্ষণে পৌঁছে গেছে পলাশীর মোড়ে। সেখানে পেয়ে যায় তারা ইপিআরটিসির বাস। সঙ্গে সঙ্গে ঘিরে ফেলে আগুন দেওয়া হয়। ড্রাইভারকে ছেড়ে দেওয়া হয়। জনতা আগুন দেয়, স্লোগান ওঠে, 'জেলের তালা ভাঙবো শেখ মুজিবকে আনবো।' জনতা আগুন দেয়, স্লোগান ওঠে, 'আগরতলা মামলা মানি না মানবো না।' সারা ঢাকায় মন্ত্রীর বাড়িতে আগুন। সরকারি সমর্থকদের সম্পত্তিতে আগুন, সরকারি বাসে আগুন আর স্লোগান 'জাগো জাগো বাঙালি জাগো।'

দৌড়াতে দৌড়াতে ওরা দুজন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কামাল বললো, 'চল আজাদ অফিসে একটু জিরিয়ে নেই খবরাখবর পাওয়া যাবে।'

আজাদ অফিসে তুমুল উত্তেজনা। সারা শহরের খবর এসে পৌঁছেছে। কারও কোথাও নিয়ন্ত্রণ নেই। সরকার আবার সান্ধ্য আইন জারি করেছে। সেনাবাহিনী নামিয়েছে রাস্তায়।

'তাড়াতাড়ি হলের দিকে চলো, এখনই গুলিগালা শুরু হবে।'

হলের দিকে ছুটতে লাগলো তারা। কার্ফু শুরু হওয়ার আগেই পৌঁছেছে। সেখানে কাদেরও অপেক্ষা করছে তাদের জন্য। কাদের ছিলো

পুরনো ঢাকায়। জানালো, মারা গেছে কমপক্ষে একজন, গুলিতে আহত হয়েছে কমপক্ষে ৪০ জন। হলে তারা ফিরেছে বটে কিন্তু মনে হচ্ছে সব ভেঙেচুরে দিতে।

পরদিন তারা হল থেকে বেরোয়নি বটে, তবে খবর পেলো অন্যান্য জায়গায়ও শুরু হয়ে গেছে। বিশেষ করে চাঁটগায় লন্ডভন্ড অবস্থা।

১৮ তারিখ সকালে কার্ফু ওঠানো হয় কয়েক ঘণ্টার জন্য। কাদের আর কামাল বেরিয়ে পড়ে বাসার দিকে। রাস্তাঘাটে লোকজন নেই। হেঁটে চলে আসে। আবারও কার্ফু হবে কিছুক্ষণ পর। ঠিক করলো কার্ফুর দিন পর্যন্ত আর বেরুবে না।

তারা বেরুলো না বটে কিন্তু দুপুরের খবরেই জানা গেলো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ডা. শামসুজ্জোহাকে মেরে ফেলেছে সেনাবাহিনী। এরপর ঢাকা শহরে আর কার্ফু রাখা যায়নি।

কার্ফু মানি না। লোকজন বেরিয়ে পড়ে। গুলি চলে। লাশ পড়ে থাকে, মানুষ পিছু হটে যায়। আবার এগোয়। আবার গুলি চলে। লাশ পড়ে থাকে। মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। গুলি খেয়ে অনেকে কাতরাতে থাকে। ২১ ফেব্রুয়ারির আগের সন্ধ্যায় কার্ফু ওঠানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যায় বিরাট মশাল মিছিল।

না, কামালকে এ দু'দিন ঘর থেকে এক পা নড়তে দেওয়া হয়নি। রহিম সাহেব কার্ফুর অজুহাতে দুদিন অফিসে যাননি। কামালকে নিচের তলায়ও নামতে দেননি। এখন মানুষের দাম বুলেটের থেকেও কম।

জ

২০ ফেব্রুয়ারি বিকেলে কার্ফু উঠে গেলো। সন্ধ্যার দিকে কামাল নিচে নেমে এলো। দোলা সামনের লনে হাঁটছিলো। কামাল বললো, 'আমার ওপর জারি করা ১৪৪ ধারা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর একটু রাস্তা পর্যন্ত হেঁটে আসি।'

গেট খুলে তারা গলিতে বেরোয়। লোকজন চলাচল শুরু হয়েছে। মুদি দোকানগুলো ঝাঁপ খুলেছে। গলি পেরিয়ে সদর রাস্তার ফুটপাতে দেখে মানুষের ভিড়। অনেকেই দাঁড়িয়ে আছে। কামাল একজনকে জিজ্ঞেস করে, 'ব্যাপার কী ?'

'মশাল মিছিল'। সংক্ষিপ্ত উত্তর।

এত কিছুর পরও মানুষ দমছে না, ভাবে কামাল, তাহলে কি বাঙালি সত্যি সত্যি জাগছে ? কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর দেখা গেলো মশাল মিছিল এগিয়ে আসছে। অন্ধকার ভেদ করে যেন আলোর যাত্রী।

সন্ধ্যার সময় ফিরতে ফিরতে কামাল বলে, 'দোলা, রেডি থাকিস, সকালেই বেরুবো।'

কামাল একটু দেরি করেই বেরিয়েছে। তার ইচ্ছে শহীদ মিনারে কিছুক্ষণ থাকবে, পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে খানিকটা আড্ডা দেবে। দোলাকে নিয়ে খানিকক্ষণ হাঁটার পর একটা রিকশা পেলো। অনেকে পুরো পরিবার নিয়ে চলছেন শহীদ মিনারের দিকে। মেয়েরা শাড়ি পরেছে। পা জড়িয়ে যাচ্ছে অনেকের, তবুও শহীদ দিবসে শাড়ি বেছে নিয়েছে শ্রদ্ধা জানাবার উপায় হিসাবে। কারও হাতে তিন চারটে ফুল। দোলা বলে, 'একটু ফুল হলে ভালো হতো।'

'ঢাকা শহরে এখন আর ফুল পাবি কোথায় ? ফুলের কালচার কী আর আমাদের হয়েছে ?'

কার্জন হলের মোড়ে নেমে পড়ে ওরা। দীর্ঘ লাইন। লাইনে দাঁড়িয়ে যায় দোলা আর কামাল। মানুষের ভিড় প্রচন্ড। একে তো একদিন গেছে কার্ফু, মানুষজন বেরুতে পারেনি, তার ওপর আজ শহীদ দিবস। বাঙালি হয়ে এমন সময় শহীদ মিনারে আসবে না তা কি হয় ? শহীদ মিনার যে সব সময় সাহসের প্রতীক।

মিনারের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে জগন্নাথ হলের পাশে ফুটপাতে গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে কামাল। দোলাকে বলে, 'বন্ধু-বান্ধবরা আসবে। একটু গল্প করে যাই কী বলিস।'

'এই দোলা না' পেছন থেকে কে যেন ডাকলো।

'আরে অনিলদা,' খুশি হয়ে ওঠে দোলা।

'কবে ফিরলি,' কামাল জিজ্ঞেস করে।

'ফিরেছি তো কয়েকদিন। এসেই আটকে গেলাম কার্ফুতে। খোঁজ-খবর নিতে পারিনি তোদের।'

'তুই একটু দাঁড়া দোলার সঙ্গে, আমি দেখি কাউকে খুঁজে পাই কি না।'

আধা ঘণ্টা পর দেখা গেল ঠিক ঠিকই কামাল, জাহিদ, কাদের, মিলি, ফাতেমা আরও কয়েকজনকে নিয়ে এগিয়ে আসছে। সামনে এসে কামাল দোলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো, 'আমার প্রতিবেশিনী, আমার ছেলে বেলার বন্ধু জহরত আরা হক।'

'বা ভারি মিষ্টি তো,' বলে মিলি, 'জহরত আরা বেশ ভারি নাম, তোমার ডাক নাম কী ?'

'দোলা'।

'বা, সুন্দর। আমি মিলি, আমাকে মিলি আপা বলে ডেকো।' দোলা ঘাড় নাড়ে। কামাল এই মিলির কথাই বলেছিলো, বেশ সুন্দর তো, মনে মনে বলে দোলা। পরনে কালো পেড়ে সাদা শাড়ি, দোহারা চেহারা, এক বেণী, কপালে ছোট একটা কালো টিপ।

ফুটপাতে পা ছড়িয়ে বসে ওরা। এতদিনের ফিরিস্তি দেয় প্রত্যেকে।

'ইউনিভার্সিটি বোধহয় আর খুলবে না', বলে জাহিদ।

'খুলবে হয়তো আইয়ুব খান গেলে,' বলে ফাতেমা।

'না, খালি খান সাহেব গেলে হবে না,' বিশ্লেষকের ভঙ্গিতে বলে কাদের, 'শেখ মুজিবকে ছাড়তে হবে। আগরতলা মামলা বাতিল করতে হবে। নির্বাচন দিতে হবে। তা'হলেই মানুষ শান্ত হবে'।

'কথাটা ঠিক,' বলে মিলি, 'মানুষ অন্য কিছু মানতে চাইবে কিনা সন্দেহ।'

'কিন্তু কতদিন আর গুলি খাবে মানুষ ?' জিজ্ঞেস করে কামাল, 'আমরা কি হিসাব করেছি গত ডিসেম্বর থেকে এ পর্যন্ত কত লাশ পড়েছে। আমরা কতজন পরিবারগুলোর খবর রাখছি, আমাদের ভাগ্য কি গুলি খাবার ?'

'ইতিহাস বলে,' জাহিদ বললো, 'যখনই গুলি খেয়েছি সাহস করে তখনই শাসক পিছিয়েছে।'

'সমস্যার একটা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত, গুলিও চলবে আন্দোলনও চলবে।' যোগ করে অনিল।

এরপর সবাই ঘরবাড়ির খোঁজ নেয়। কাদের কামালের বাড়ি যাওয়ার গল্প শোনায়। ঠাট্টা করে বলে, 'মিলি কামাল কিন্তু তোমাকে একবার ওর বাড়ি নিয়ে যেতে চায় ইতিহাস লেখার জন্য।'

কথাটা শুনে দোলা গম্ভীর হয়ে যায়। মিলি উত্তর দেয়, 'পলিটিক্যাল সায়েন্স কি ইতিহাস থেকে বাদ দেওয়া যায়। যাবো না হয় আমরা একবার হইচই করে।'

'এই আন্দোলনে আমাদের কামাল সাহেবও একটু স্থান করে নিয়েছেন,' জানালো জাহিদ, 'ওর রিপোর্টগুলো মারমার কাটকাট।'

সবাই এক বাক্যে তা স্বীকার করে। খুশি হয়ে ওঠে কামাল মনে মনে। 'শামসুর রাহমানের আসাদের শার্ট কবিতাটা পড়েছো দৈনিক পাকিস্তানে।'

জিজ্ঞেস করে মিলি কামাল-কে। 'বহুদিন এ রকম কবিতা পড়িনি। কবিতাটা পড়তে পড়তে মনে হলো ঠিক আমাদের সময়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছি।'

'এই কারণেই তিনি শামসুর রাহমান,' বলে কামাল, 'না আমি পড়িনি।'

আরও কিছুক্ষণ গল্প করে তারা এগোয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। টিএসসির সামনে যে যার পথ ধরে। কামাল, কাদের, দোলা এগিয়ে যায় শাহবাগের দিকে। শহীদ মিনারে যাওয়ার লোকের বিরাম নেই। কাদের, কামাল দোলাকে রিকশায় উঠিয়ে দেয়। বলে, 'বিকেলে পল্টনে কিন্তু ছাত্র সংগ্রাম কমিটির মিটিং। যাবি নাকি, তাহলে এক সঙ্গে যাওয়া যাবে।'

'না,' বলে কামাল, 'বরং আগামীকাল কলাভবনে থাকিস।'

রিকশা রমনার শালগাছগুলো পেরুবার পর, দোলা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, 'মিলি আপার সঙ্গে তোর খুব খাতির, তাই না ?'

'না, খাতির কোথায়,' বলে কামাল, 'আমাদের ফার্স্ট গার্ল। এক-আধটু পরিচয় তো থাকবেই সহপাঠিনীর সঙ্গে। তা'ছাড়া তার সঙ্গে অনেক বিষয় আলাপ করা যায়।'

'অ।' দোলা আর কিছু বলে না।

সকালে কামাল আগে আজাদ অফিসে যায়। সবাই তখনও আসেনি। যে কয়জন এসেছিলো তাদের সঙ্গে আলাপ হয়। গতকাল ছাত্র সংগ্রাম কমিটির মিটিংয়ে নাকি তিল ধারণের জায়গা ছিলো না। তাদের দাবি শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দির মুক্তি আর ১১ দফা বাস্তবায়ন। শুধু ঢাকা নয়, সারাদেশেই সমাবেশ হয়েছে। পুলিশ, সেনা কাউকেই মানুষজন কেয়ার করছে না।

'পশ্চিম পাকিস্তানের কথা জানি না,' বললো এক সাংবাদিক, 'কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে এখন কোনও সরকার নেই।'

মধুর ক্যান্টিনে কাদেরসহ আরও কয়েকজনকে পেল কামাল। উত্তেজিত তর্ক চলছে তাদের মধ্যে। আর কতদিন কর্মসূচি দিতে হবে। এমন সময় দু'তিনজন দৌড়ে এসে জানালো, 'শেখ মুজিব ছাড়া পেয়েছেন।'

একথা শোনা মাত্র হুল্লোড় উঠলো ক্যান্টিনে। এক দৌড়ে বেরিয়ে এলো সবাই। ছুটছে সবাই শাহবাগের দিকে। রাস্তায়ও হুড়োহুড়ি, খবর ছড়িয়ে গেছে শেখ মুজিবসহ সবাই মুক্তি পেয়েছেন। কে একজন স্লোগান দিলো, 'চল চল ক্যান্টনমেন্ট চল'। চরম উত্তেজনা চারদিকে। হাঁপাতে হাঁপাতে কাদের আর কামাল ফার্মগেট পৌঁছলো। এখানে সেখানে জটলা। কে

একজন বললো, '৩২ নম্বর চল।' সবাই ছুটলো ৩২ নম্বরে। ৩২ নম্বরে পৌঁছে দেখে সেখানে ঢোকার জায়গা নেই। কামাল কাদের পথ করে ৩২ নম্বরের উল্টো দিকে লেকের পাড়ে দাঁড়ায়।

তখন বিকেলের ছায়া চারদিকে। শেখ মুজিব বারান্দায় দাঁড়িয়ে, ক্লান্ত, গলায় ফুলের মালা। চারদিকে স্লোগান, কোলাকুলি। আনন্দে মানুষজন কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটালো তারা ৩২ নম্বরের সামনে। কামাল তখন আবিষ্কার করে তার পায়ে একটি স্যান্ডেল নেই। ছোটাছুটিতে এক পাটি কোথায় চলে গেছে সে টেরও পায়নি। ফেরার পথে কাদের ছাত্রলীগের এক কর্মীর কাছে শুনলো, আগামীকাল রেসকোর্সে ছাত্র সংগ্রাম কমিটি শেখ মুজিবকে সংবর্ধনা দেবে।

পরদিন রেসকোর্স লোকে-লোকারণ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কেউ নেই যে আসেনি। কামালদের গ্রুপটি এক সঙ্গে এসেছে। ছাত্র নেতারা বক্তৃতা করছেন। গোলটেবিল বৈঠকের কথাও আসছে। অনেকে এর বিরোধিতা করছেন, বিশেষ করে ভাসানীপন্থি ছাত্ররা। ভাসানী অবশ্য আগেই এর বিরোধিতা করছিলেন। তোফায়েল আহমদ বক্তৃতা দিতে উঠলেন। এক পর্যায়ে বললেন, বাংলার মানুষের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেওয়া হলো, সারা মাঠ করতালিতে ফেটে পড়লো।

সন্ধ্যায় বাসায় ফেরার আগে ক্লান্ত সবাই বসছে টিএসসিতে।

'বঙ্গবন্ধু মানে বাংলার বন্ধু। শেখ মুজিবুর রহমান থেকে বঙ্গবন্ধু হতে লাগলো তাঁর ২২ বছর।'

'এর মধ্যে ১২/১৩ বছরই জেলে।' যোগ করলো অনিল।

'এর মধ্যে কতবার তিনি পিছিয়েছেন, এগিয়েছেন,' বললো জাহিদ, 'কিন্তু লক্ষ্য থেকে সরেননি।'

'আচ্ছা তাঁর সময় তো অনেকেই রাজনীতি করেছেন, তাদের অবদানও কম নয়, কিন্তু তিনিই হলেন 'বঙ্গবন্ধু', বললো কামাল।

'কারণ, তিনি আমাদের নাড়ি বুঝেছেন' বলে কাদের।

'আমি বলবো সাহস।' বলে মিলি, 'সত্যিকারের রাজনীতিবিদ হতে হলে লাগে সাহস। শাসকরা সবসময় সাধারণ মানুষকে দমিয়ে রাখতে চায়। তাদেরকে নেতৃত্ব দিতে হলে লাগে সাহস। শেখ মুজিবের তা আছে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মতো মামলায়ও তিনি মাথা উঁচু করেছিলেন।' এক নিঃশ্বাসে বলে মিলি, 'লক্ষ্য করেছো, তাঁকে যখন 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি

দেওয়া হলো সবাই হাততালি দিয়েছে। রেসকোর্সে তো সব আওয়ামী সমর্থক ছিলো না।'

'এই বঙ্গবন্ধুই আমাদের স্বায়ত্তশাসন এনে দেবেন।' কাদের খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে।

ঝ

একটি দু'টি করে ক্লাস শুরু হয়েছে। কিন্তু কামাল লক্ষ্য করে আইয়ুব খান পশ্চিম পাকিস্তানে যে গোলটেবিল বৈঠক ডেকেছেন তাতে রাজনীতিবিদরা যোগ দেবেন কি না তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়েছে। কামালকে তো একদিন ওবায়েদ বলেই ফেললো, 'গোলটেবিল বৈঠকে শেখ সাহেব যোগ দিলে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন।' ওবায়েদ মেনন গ্রুপের একজন নেতা।

'৬ দফা আর ১১ দফার কথা বলতে তো বঙ্গবন্ধুকে বৈঠকে যেতেই হবে।' কাদের ঘোষণা করে।

কামাল, জাহিদ, মিলি যারা সরাসরি দল করে না তারা খানিকটা বিভ্রান্ত। যে লোকটির কারণে এতো নির্যাতন, নির্যাতনের বিরুদ্ধে মিছিল, এতো লোক প্রাণ দিলো তার আহ্বানে কেন সাড়া দিতে হবে ? এক সময় প্রশ্ন জাগে। আবার মনে হয়, সাড়া না দিয়ে নির্বাচনের কথা না বললে তাদের ক্ষমতা থেকে হটাবে কীভাবে ? রাষ্ট্রশক্তিকে চ্যালেঞ্জ করতে হলে প্রচন্ড শক্তির দরকার। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ছাত্র কামাল তা বোঝে।

তবে, এটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, আইয়ুব খান হটে যাচ্ছেন। তার এক সময়ের প্রিয় জুলফিকার আলী ভুট্টো তার বিরুদ্ধে বিষোদগার করছেন। আর এখানে তো এই অবস্থা। ২১ ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করতে হয়েছে। আইয়ুব খান ঘোষণা দিয়েছেন তিনি আর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়াবেন না।

'এখন যদি আমাদের মধ্যে ফাটল ধরে তা'হলে তো সব ভেস্তে যাবে।'

বঙ্গবন্ধু হওয়ার দু'দিনের মাথায় ডাক নেতাদের নিয়ে শেখ মুজিব চলে গেলেন গোলটেবিল বৈঠকে। মওলানা ভাসানী বিরোধিতা করলেন বটে কিন্তু নিজেও সপ্তাহ দু'য়েকের মাথায় পশ্চিম পাকিস্তানে গেলেন।

পরিস্থিতি শান্ত হয়নি, কিন্তু ক্লাস চলছে। ছাত্ররা খানিকটা শান্ত কিন্তু অন্যান্য পেশার লোকজন দাবি-দাওয়া নিয়ে এগিয়ে আসছেন। গোলটেবিল

বৈঠক মুলতুবি করে আবার শুরু হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ঠিক ঠিকই ৬ দফা, ১১ দফার দাবি তুললেন। কিন্তু কাদের ঐ যে হাঁসদের কথা বলেছিলো তারা এর বিরোধিতা করলেন। শেখ মুজিব ফিরে এলেন। জানালেন কুচক্রী ফরিদ আহমদ, হামিদুল হক চৌধুরী, আবদুস সালাম খান ও মাহমুদ আলীর জন্য বৈঠক ব্যর্থ হয়েছে।

কামাল এখন আর মিছিলে যায় না। লেখালেখি করার চেষ্টা করছে। কিন্তু মন বসাতে পারে না। রাস্তা থেকে মানুষজন হটেনি। মোনেম খান এখনও জগদ্দল পাথরের মতো বসে আছে। এনএসএফের দাপট অবশ্য কমেছে। আজাদে তার অবস্থার উন্নতি হয়েছে। প্রথম মাসে শ'দেড়েক টাকা পেয়েছে। টাকা পাওয়া মাত্র বন্ধুদের শরীফ মিয়ার বিরিয়ানি খাইয়েছে। আর মরণ চাঁদের মিষ্টি কিনে নিয়ে গেছে নিজের আর দোলাদের বাসার জন্য।

'আয় তোকে একটু মিষ্টি খাইয়ে দিই,' একটা সন্দেশ নিয়ে দোলাকে বলে কামাল, 'জন্মাবার পর তো চাচী তোর মুখে মধু দেননি।'

দোলা মিষ্টিটা নেয়। একটু করে কামড় দেয়। তারপর বলে, 'মিলি আপার মুখে বুঝি ওনার মা দু'চামচ মধু দিয়েছিলেন ?'

শেখ মুজিব সবাইকে অনুরোধ করছেন শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য। রাস্তা আবার অশান্ত হয়ে উঠছে। এরই মাঝে একদিন কামাল গুলিস্তান থেকে বাসে উঠছে, কে একজন বললো, 'মোনেম খান পদত্যাগ করেছে, রেডিওর খবর।'

'হারামজাদা গেছে,' চিৎকার করে উঠলো অনেকে সোল্লাসে।

পল্টনের মোড়ে নেমে দেখে রাস্তায় ছোট ছোট জটলা। মুদি দোকানের সামনে অনেকে দাঁড়িয়ে। ছোট একটা ট্রানজিস্টর বাজছে। পরবর্তী খবর শোনার জন্য অপেক্ষা করছে অনেকে।

'মোনেম খান পালিয়েছে,' খবর দিলো একজন।

'গভর্নর কে হলো ?'

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার নুরুল হুদা,' আরেকজন জানায়।

ছাত্ররা উল্লাসের সঙ্গে যে মোনেম খানের বিদায় পালন করবে তা হলো না। বরং দেখা গেলো মওলানা ভাসানী যেদিন ফিরলেন সেদিন তেজগাঁ এয়ারপোর্টে ভিড়। কামাল মধুর ক্যান্টিনে জিজ্ঞেস করে জাহিদকে, 'আচ্ছা, আমি তো জানতাম মওলানা সাহেব আইয়ুব খানের অনেক কিছু সমর্থন

করেছেন যা শেখ মুজিব করেননি। এখন আবার উল্টো গীত গাইছেন কেনো তিনি ?'

'মওলানা সাহেব সারাটা জীবন এমনই করেছেন,' জাহিদ বলে, 'তাঁর ধৈর্য কম। এ জন্য তিনি কোথাও সফল হবেন না। মাঝে-মাঝে হয়তো বাহবা পাবেন।'

২৫ মার্চ আইয়ুব খান পদত্যাগ করলেন কাঁদুনি গেয়ে। তিনি যাকে প্রধান সেনাপতি করেছিলেন সেই ইয়াহিয়া খান তাকে হটিয়ে দিয়ে প্রেসিডেন্ট হলেন। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানও ঠিক একই কাজ করেছিলেন।

২৫ মার্চও হরতাল ছিলো। গুলিও চলেছিলো। মারা গেছে একজন। আইয়ুব খান গেছে কিন্তু রাস্তায় মিছিল নামলো না। হক চাচার বাসায় তারা সবাই ট্রানজিস্টরে খবর শুনছিলো। ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করলেন, মার্শাল ল' জারি করা হলো। সকল রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ।

রহিম সাহেব বললেন, 'এক খান গেলো, আরেক খান এলো, তা আমরা পেলাম কী ? নাকের বদলে নরুণ।'

'আমরা পেলাম ঊনসত্তর,' বললেন হক চাচা, তিনি সব সময় আশাবাদী, 'ধৈর্য ধরেন, যা দেখেছি গত এক বছরে এই খানও বেশিদিন থাকবে না।'

'আপনার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক,' বললেন রহিম সাহেব। গলায় হতাশা, কামাল গুম হয়ে বসে। 'এত লাশ, এতো কষ্ট ? সব কি বিফলে যাবে,' ভাবলো সে। না, তার কাজ লেখালেখি। এখন থেকে পড়াশোনা আর লেখালেখি।

'যাক, আমাদের পড়াশোনার যুগ আবার শুরু হলো,' ঘোষণা করলো দোলা।

এও

পড়াশোনা শুরু হলো বটে কিন্তু পড়াশোনায় মন বসে কই। কামাল কিছু টাকা জমিয়েছিলো, বাকিটা বাবার কাছ থেকে নিয়ে চমৎকার একটা র‍্যালি সাইকেল কিনে ফেললো। তারপর আর তাকে পায় কে ? সকালে বেরোয়, সন্ধ্যায় ফেরে। আজাদের রিপোর্টিংয়ের থেকে তার মন এখন লেখালেখিতে। প্রায় দুপুরটা সে শাহরিয়ার আর আলী ইমামের সঙ্গে কাটায়

ইত্তেফাকের কচি-কাঁচার আসরের দাদা ভাইয়ের ঘরে। দুপুরে ইত্তেফাক অফিসের উল্টোদিকের রেস্টুরেন্টে পরোটা ভাজি খেয়ে নেয়। নয়তো ক্লাস সেরে চলে যায় দৈনিক পাকিস্তানে, কখনও সাত ভাই চম্পার আফলাতুন ভাইয়ের রুমে, কখনও বা আহসান হাবীবের কাছে। এখন সে শুধু 'ছোটদের লেখক' হিসেবে নয় বড়দের লেখক হিসেবেও এক আধটু পরিচিত হচ্ছে। সত্যেন সেন উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী করেছেন, তাকেও বলেছেন সঙ্গে থাকতে।

সত্যেন সেনের সঙ্গে পরিচয়টা হলো খানিকটা অদ্ভুতভাবেই। শরীফ মিয়ার ক্যান্টিনে একদিন দেখা আহমদ ছফার সঙ্গে। লিকলিকে চেহারা, কথা বলেন বিশেষ ভঙ্গিতে। উঠতি সাহিত্যিক। ছফা ভাই হিসেবেই কামালদের কাছে পরিচিত। অদ্ভুত অদ্ভুত শখ আছে তার। কামালদের মহলে একটু পাগলাটে হিসেবে পরিচিত। বড় বড় সাহিত্যিক সবার সঙ্গেই পরিচয় আছে।

শরীফ মিয়ায় চা খাচ্ছে কামাল। ছফা ভাই চিকন গলায় বললেন, 'কামাল, দৈনিক পাকিস্তানে তোমার গল্পটা পড়েছি। আমার ভালো লেগেছে। চল তোমাকে সত্যেনদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।'

সত্যেন সেনের নাম শুনেছে কামাল। নামী কমিউনিস্ট কর্মী। বিখ্যাত ক্ষিতিমোহন সেনের ভাগ্নে। কিছুদিন হলো জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। জেলে বসে যে সব পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছিলেন সেগুলো এখন বই আকারে প্রকাশ করছেন। কামাল জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় ?'

'নারিন্দা, এখনই চলো।'

ছফা ভাই এ রকমই। কামাল শরীফ মিয়ার কাছে সাইকেল রেখে রিকশা নিয়ে চললো নারিন্দা। গনগনে দুপুরে ছফা ভাই নারিন্দার গলিতে এঁদো এক বাড়ির কড়া নাড়লেন। সত্যেনদা এখানে একটি পরিবারের সঙ্গে থাকেন। ছফা ভাই তাকে এমনভাবে পরিচয় করিয়ে দিলেন যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা লেখক সে। পুরু চশমা চোখে, চোখে প্রায় দেখেন না সত্যেন সেন। বললেন, 'হ্যাঁ, লেখা পড়েছি। তোমাকে পেয়ে ভালোই হলো। শোন, আমি দেশ সম্পর্কে কিছু ছোট বই ছাপার পরিকল্পনা করেছি। প্রথমটা লিখবেন মুজাফফর আহমদ।'

'কে, ন্যাপের মুজাফফর আহমদ ?' কামাল জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ, দ্বিতীয় বইটা তুমি লিখে দাও।'

'আমি ?' বিস্ময়ে প্রশ্ন করে কামাল।

'হ্যাঁ, তুমি রেবতী বর্মণের বইটা পড়েছো, ওইটার ধাঁচে।'

ছফা ভাইয়ের মুখে বিজয়ীর হাসি। ভাবটা এমন, কেমন বলেছিলাম না, আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর ছফা ভাইয়ের সঙ্গে বেরিয়ে আসে। ছফা ভাই বলেন, 'তাড়াতাড়ি বইটা লেখো। আমার প্রেস্টিজ নষ্ট করো না।'

কামাল অভিভূত। ঘটনাটা কাউকে সে বলেনি। বইটা সে লিখুক, ছাপা হোক তারপর চমকে দেওয়া যাবে সবাইকে। এভাবে ছফা ভাই তাকে আরও পরিচয় করিয়ে দেয় অনেকের সঙ্গে। কামালের আকাশটা বড় হয়ে ওঠে।

কাদেরের সঙ্গে আর তেমন দেখা হয় না। অনিল ব্যস্ত সংস্কৃতি সংসদ নিয়ে। কামালকে মাঝে-মাঝে সংস্কৃতি সংসদে নিয়ে যায়। পরিচয় হয় তুখোড় ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে। কামাল পরে ভেবে দেখেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নামি ছাত্রদের একটা বড় অংশ সংস্কৃতি সংসদের সঙ্গে জড়িত।

মিলির সঙ্গে ক্লাসেই যা দেখা হয়। কামালের নতুন জগত তাদের অপরিচিত। কিন্তু এই অপরিচিত জগতটা কামালের ভালো লাগে। সত্যেন সেনের বইটা লেখার জন্য লাইব্রেরিতে যাওয়া শুরু করেছে।

দোলার সঙ্গে যে মাঝে-মাঝে দেখা হয় না তা নয়। কিন্তু, কথাবার্তা তেমন জমে না, দোলা ব্যস্ত পড়াশোনা আর কলেজ নিয়ে। তার পরীক্ষা সামনে।

কামালদের সাবসিডিয়ারি পরীক্ষার তারিখ পড়েছে। কামাল ইতিহাসটা ম্যানেজ করতে পারবে। ইংরেজিটা খটোমটো। ইতিহাসে পড়ান গিয়াসউদ্দিন আহমদ। গমগমে গলার স্বর, কী হ্যান্ডসাম। ক্লাসের মেয়েরা হা করে তাকিয়ে থাকে। আর পড়ানও দারুণ। আবুল খায়েরও পড়ান। পড়াতে পড়াতে অন্য মনস্ক হয়ে যান। ইংরেজিতে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আসেন, লাজুক ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে কবিতা পড়ান, কিছু বোঝে কিছু বোঝে না। ভালো লাগে রাজিয়া খানের নাটক পড়ানো। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় একটা উপন্যাস লিখে নাম করেছেন। ইংরেজি উপন্যাস আর গল্পগুলো যাচ্ছেতাই। কামাল কেন তার পরিচিতদের অধিকাংশেরই পড়াশোনা তেমন হয়নি।

মিটিং-মিছিল তেমন একটা হয় না। তাই বলে একেবারে বন্ধ তাও নয়। এই মার্শাল ল বা সামরিক আইনটা কেউ পছন্দ করছে না। সবাই তাকিয়ে আছে মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবের দিকে।

'তারা দু'জন যদি এক হন তা'হলে ঊনসত্তরের একটা প্রতিশোধ নেওয়া হতে পারে।' বলে জাহিদ।

'কিন্তু, মওলানা সাহেব তো বঙ্গবন্ধুকে পছন্দ করেন না গোলটেবিল বৈঠকে যাওয়ার জন্য।' বলে কাদের। শরীফ মিয়ায় চা খেতে খেতে আলোচনা চলছিলো।

'শেখ মুজিব একা হয়ে গেছেন।' বলে কামাল, 'কেউ তাকে পছন্দ করছে না, মানে রাজনৈতিক নেতারা.....।'

'কিন্তু সাধারণ ছাত্র ও মানুষের বিশ্বাস আছে বঙ্গবন্ধুর ওপর,' বলে কাদের 'আমি ছাত্রলীগ করছি দেখে বলছি না। একদিন সব মানুষ তাঁকেই সমর্থন দেবে।'

সাবসিডিয়ারি পরীক্ষার আগে একমাস আর কামাল বেশি বেরুলো না বাসা থেকে। ৬ পেপার ৬০০ নম্বর পরীক্ষা। সিলেবাসও তার তেমন জানা নেই। বন্ধু-বান্ধবদের নোট দেখে দশটা করে প্রশ্ন তৈরি করে। দোলারও পরীক্ষা। দু'একদিন বোর লাগলে গেছে দোলার সঙ্গে গল্প করতে। দু'এক কথার পর স্রেফ এক কথায় দোলা বলেছে, 'দ্যাখ, আমার পরীক্ষা ডিস্টার্ব করবি না। আমাকে পরীক্ষায় ভালো করতে হবে। তুই ফেল করলেও কিছু আসে যাবে না।'

'কেন ভালো করতে হবে' ঠাট্টার সুরে জিজ্ঞেস করে কামাল, 'বিয়ের জন্য ভালো পাত্র পেতে হবে?'

'হ্যাঁ, পেতে হবে। তাতে তোর আপত্তি আছে?'

এ কথার পর কামাল আর নিচে নামে না। পড়তে পড়তে অসহ্য লাগলে কাদেরের বাসায় যায়। নির্বিঘ্নে পরীক্ষা হয়ে গেলো। রেজাল্ট পরে বের হবে, তবে তারা থার্ড ইয়ারে ভর্তি হয়ে গেছে। ঢিলেঢালাভাবে ক্লাস শুরু হয়েছে। আর এক বছরের মধ্যে তারা অনার্স ডিগ্রি পেয়ে যাবে। সবার মধ্যেই একটা ফুরফুরে ভাব। দোলারও পরীক্ষা শেষ। কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী সে। বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ছাত্রছাত্রী ভর্তি শুরু হয়েছে।

অনিল সংস্কৃতি সংসদের ফাংশন নিয়ে খুবই ব্যস্ত। কামালকে একদিন বলে, 'আয় না, একটু কাজটাজ কর। মিলি, ফাতেমা এরাও কাজ করছে।'

'আমি বই লেখায় ব্যস্ত,' বলে কামাল।

'বই লেখায় ব্যস্ত মানে।' অনিল বলে, 'শালা ফাজলেমি করছিস।'

'ফাজলেমি না, বের হলেই দেখবি।'

'ঠিক আছে আঁতেল, দেখা হবে।'

দোলার সঙ্গে ইচ্ছে করেই সে খুব একটা দেখা করে না। আগে বিকেলে দোলা বাসায় থাকতো, এখন নিয়মিত যায় ছায়ানটে। নিত্যদিন না হলেও, বাসায় বসে প্র্যাকটিস করে। তবুও একদিন দোলার সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেলো।

এক বিকেলে লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে শরীফ মিয়ায় যাচ্ছে চা খেতে। দেখা মিলি আর অনিলের সঙ্গে। অনিল বললো, 'শোন তোকেই খুঁজছি, বিপদে পড়েছি, উদ্ধার করতে হবে।'

'কী বিপদ'।

'আমাদের ফাংশন পরশু। গান গাওয়ার কথা ছিলো নীলার, তার এখন প্রচন্ড জ্বর।'

'তাতে কী ?' কামাল বলে, 'আইটেম একটা না হয় বাদই গেলো।'

'আরে না, রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে শেষ হবে। ওইটেই শেষ আইটেম এবং নীলার। এখন রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পারে এমন একজনকে লাগবে। দোলাকে একটু বলতে হবে।'

'বলিস কী, সে তো কলেজে পড়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী না।' বলে কামাল।

'আরে আমাদের ফাংশন কি খালি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নাকি। বাইরের অনেকেও আসছে না।'

'তা বল গিয়ে দোলাকে।' বলে কামাল।

'আরে না, আমি বললেই কী হবে নাকি, আবার ইগোর ব্যাপার আছে না, রিপ্লেসমেন্ট শুনলে বুঝিস তো, চল চল।'

এক রকম কামালকে টেনে নিয়ে চললো অনিল। মিলিকে বললো, 'তুমি রিহার্সাল সামলাও, আমি কাজটা সেরে আসি।'

'মিলিও কি আছে নাকি ?'

'হ্যাঁ, আমি আবৃত্তি করছি, শামসুর রাহমানের সেই কবিতাটা-আসাদের শার্ট। শুনবে সেদিন।' এমনভাবে বললো যেন কামাল যে যাবে সে বিষয়ে নিশ্চিত।

পল্টনে বাসার গেট খুলে ভেতরে ঢুকতেই শোনা গেলো দোলার গলা, প্র্যাকটিস করছে। অনিল বারান্দার গ্রিলের কাছে দাঁড়ালো। দোলা তাদের দু'জনকে দেখে গান থামিয়ে বললো, 'আরে অনিলদা আস আস কী ব্যাপার।'

'না, আসব না দোলা, বিপদে আছি। পরশু ফাংশন। শেষ আইটেম রবীন্দ্রনাথের দু'টি দেশের গান। তোমাকে গাইতে হবে।'

'আমি,' দোলা অবাক হয়, সে কখনও পাবলিক ফাংশনে গান গায়নি তাও আবার ইউনিভার্সিটিতে। সে তো সেখানে পা রাখেনি।

'কামাল তোমাকে নিয়ে যাবে।' দোলাকে আর কথা বলার সুযোগ দিতে চায় না। কোনও রকমে দু'টি গান হলেই পার পেয়ে যায়। না হলে সে ঝামেলায় পড়বে। আর ঐ সব ফাংশনে গানের গুনাগুণ নিয়ে কে ভাববে।

'চলি আমি, তাহলে পরশু সন্ধ্যা সাতটায় দেখা হবে।' বলে অনিল।

'তোমার বন্ধু কি আমাকে নিয়ে যাবে ? হ্যাঁ না কিছু বলেনি কিন্তু।'

'ও নেবে না ওর ঘাড়ে নেবে।' বলে অনিল গেট খুলে বেরিয়ে যায়। নিরুপায় একটা ভঙ্গি করে কামাল বলে, 'পরশু রেডি থাকিস।'

ফাংশনের দিন কামাল বিকেলে শেভ করে ধোপদুরস্ত পাজামা-পাঞ্জাবি পরে নিচের ফ্ল্যাটের দরজায় কড়া নাড়ে। দোলার মা খুলে দেন। কামাল ব্যস্ত সুরে বলে, 'কই চাচী আপনার মেয়ে রেডি,' বলে দোলার ঘরের দিকে এগোয়।

'আরে ছেলে, রেডি তো বটেই, আমার পাশেই।'

কামাল চমকে যায়। শাড়ি পরা দোলা। পরিপাটি বেণী, কপালে টিপ, ঠোঁট টিপে হাসছে। এতো বড় হলো কবে সে ? কামাল অবাক হয়ে ভাবে। এ যে ভারি সুন্দর এক তরুণী। দোলা বলে, 'চল।'

রিকশায় ওঠে একটু বিহ্বল সুরে কামাল বলে, 'তোকে তো চিনতেই পারিনি। এতো বড় হলি কবে।' দোলা একটু হাসে, উত্তর দেয় না।

টিএসসি জুড়ে ভিড়। নতুন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেশি। হল ভর্তি। অনিল একবার বাইরে যাচ্ছে, ভেতরে যাচ্ছে। কামাল দেখে বললো, 'যা টেনশনে রেখেছিলি, যা বাঁচালি। দোলা চলো।' কামালের দিকে না তাকিয়ে দোলাকে নিয়ে স্টেজের দিকে ছুটলো।

যাকে বলে নাচ-গান, আবৃত্তি ও যন্ত্রসংগীতে ভরপুর। মাঝে-মাঝে হাততালি, মাঝে-মাঝে দুয়ো। এক সময় ঘোষণা করা হলো—এবার সাম্প্রতিক সময়ের একটি কবিতা আবৃত্তি করবেন মিলি ইসলাম।

কামাল পিছে দাঁড়িয়ে। কোথাও বসার জায়গা নেই। মিলি পরেছে এক জামদানি, কপালে লাল টিপ। কামাল মনে মনে ওর রুচির প্রশংসা করে। সুরেলা গলায় মিলি বললো—'কবি শামসুর রাহমান কিছু দিন আগে একটি

কবিতা লিখেছেন। আমাদের সময়ের কবিতা—নাম—আসাদের শার্ট। আমি আপনাদের এখন তা আবৃত্তি করে শোনাচ্ছি?'

আসাদের শার্ট শব্দ দু'টি শোনার পর হল হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে গেলো। '৬৯ তো ভোলার কথা নয়। মিলি শুরু করলো,

'গুচ্ছ গুচ্ছ রক্ত করবীর মতো কিংবা সূর্যাস্তের
জ্বলন্ত মেঘের মতো আসাদের শার্ট
উড়ছে হাওয়ায়. নীলিমায়'

মিলির সুরেলা স্বর অডিটোরিয়ামে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে
'উড়ছে, উড়ছে অবিরাম
আমাদের হৃদয়ের রৌদ্র-ঝলসিত প্রতিধ্বনিময় মাঠে,
চৈতন্যের প্রতিটি মোর্চায়...'

সবাই যেনো চোখের সামনে দেখে পল্টনের মাঠে মঞ্চের ওপর উড়ছে সেই রক্তমাখা শার্ট।

'আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা কলুষ আর লজ্জা
সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখন্ড বস্ত্র মানবিক;
আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।'

মিলি শেষ করে। আবেগে কামালের চোখে পানি। সে নিজেই অবাক হয়। সমস্ত হল স্তব্ধ। তারপর করতালিতে ফেটে পড়ে সবাই। মিলি মাথা নুইয়ে আস্তে আস্তে উইংসের আড়ালে চলে যায়। কামাল ভাবে, 'এ রকম একটা কবিতা লিখে মরে গেলেও আফসোস নাই।'

আরও দু'একটা আইটেমের পর ঘোষণা করা হয়। 'সবার শেষে রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে মঞ্চে আসছেন জহরত আরা হক।'

কয়েকজন উঠে দাঁড়ায়, 'আরে চল কী প্যান প্যান শুনবো।' একজন বলে ওঠে, 'আরে এতক্ষণ বসলি, এখনিই তো শেষ হবে।' কামাল ভাবে, মেয়েটা যে কী করে। ইজ্জত বাঁচলে হয়।

জহরত আরা ওরফে দোলা মঞ্চে পরিপাটি হয়ে বসে হারমোনিয়াম নিয়ে। তবলা, মৃদঙ্গ, তানপুরা নিয়ে অন্যান্যরা। অনিল সবদিক ভেবে রেখেছে। দোলা সামনের দিকে তাকিয়ে শুরু করলো—

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান।।

আবারও পিনপতন নিস্তব্ধতা। কামাল শুনছে আর অবাক হয়ে ভাবছে, এ তার ছেলেবেলার সাথী দোলা! পুরো হল স্তব্ধ করে দিয়েছে।

এতদিন মানুষ কেনো গুলি খেয়েছে। কেনো মিছিল করেছে যেন স্পষ্ট হচ্ছে। আবেগে আবেগে তার গলার কাছে কান্না দলা পাকিয়ে ওঠে। দোলা গান শেষ করে একবার সামনে তাকায়। এক মিনিট বিরতি নিয়ে আবার গায়—

আমার সোনার বাংলা আমি,
তোমায় ভালোবাসি

হঠাৎ কী হলো। দর্শকরা সবাই গলা মিলিয়ে গান গাইতে লাগলো। গানের একেকটা পঙ্‌ক্তি সবাইকে আবেগে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। দোলার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকরা গান শেষ করে। পর্দা ঢেকে দেয় স্টেজ।

কামাল ভিড় ঠেলে এগিয়ে যায় স্টেজের দিকে। দোলাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে অনেকে। মিলি কোত্থেকে এসে দোলাকে জড়িয়ে ধরে। অনিলের ভঙ্গিটা এমন যেনো সেই আবিষ্কার করেছে নতুন এই গায়িকাকে। কামালকে কেউ খেয়াল করে না। কামালই এক সময় মিলিকে বলে, 'মিলি দারুণ আবৃত্তি করেছো। চোখে পানি চলে এসেছিলো।'

মিলি বলে, 'আর আমাদের দোলার গান'।

কামাল হেসে বলে, 'লা জবাব'। তারপর দোলার দিকে ফিরে বলে 'চল'।

ওরা যখন টিএসসি থেকে বেরোয় তখন ভিড় কমে গেছে। রিকশা পেয়ে যায় তখনই। রমনার সেই সেগুন বীথি পেরুবার সময় হঠাৎ কামাল বলে 'দোলা, তুই সত্যিই দেখতে মিষ্টি'।

'তাই নাকি' হেসে দোলা চিমটি কাটে কামালের হাতে।

'আহ', ব্যথা পেয়ে বলে কামাল, 'আর তুই এতো সুন্দর গান করেছিস ভাবতেই পারিনি। আমার খুব গর্ব হচ্ছিলো রে।'

'তাই, আমার ভাগ্য জনাব কামাল উদ্দিন রহিম'।

'না, তুই আর সিরিয়াস হতে পারলি না।'

রিকশা থামে গেটের পাশে। কামাল নামে। দোলা শাড়ি গুছিয়ে নামতে গিয়ে হোঁচট খায়। কামাল ঝট করে তাকে দুহাতে ধরে ফেলে। দোলা বলে, 'হাত না যেন লোহা'।

'ও, সরি', বলে কামাল, 'তুই তো পড়ে যাচ্ছিলি, আচ্ছা তোর সেন্টের গন্ধটাও তো চমৎকার।'

'মারব একটি চাটি', বলে দোলা এগোয়।

দরজা খুলে দাঁড়িয়ে চাচী, পেছনে চাচা। চাচী জিজ্ঞেস করেন, 'কেমন হলো কামাল তোমাদের ফাংশন। কেমন গাইলো আমার মেয়ে।'

'লা জবাব।'

ট

বিকেল বেলা কামাল একমনে সাইকেলটা মুচছে। চেন তেলে চুবানো। সকালে বেরুবে। তারই প্রস্তুতি। অনেকে অবাক হয়, কামাল যে এতটা সময় ব্যয় করে সাইকেলের জন্য। দোলা ফিরেছে কলেজ থেকে। কামালকে দেখে বললো, 'আরে কী কান্ড! তুই বাসায় ব্যাপারটা কী ?'

'সকালে সত্যেনদার কাছে যেতে হবে, বইয়ের কভার করতে।'

'সেটা আবার কী ?' জিজ্ঞেস করে দোলা।

'ভেবেছিলাম, সারপ্রাইজ দেবো, যাক আমার একটা বই বেরুচ্ছে।'

'আচ্ছা, সাইকেলটার প্রতি তোর যে আকর্ষণ, সেটির খানিকটা যদি, আমাদের কথা বাদ দে চাচা-চাচীর প্রতি থাকতো তাও বুঝতাম।'

কামাল জবাব দেওয়ার আগেই দোলা ঘরে ঢুকে গেলো।

খুব সকালেই কামাল বেরিয়েছে। যাবে বাংলাবাজার। সত্যেনদা 'কালিকলমে' অপেক্ষা করবেন। আলীম ভাই নামে এক ব্যবসায়ী বইয়ের দোকানটা খুলেছেন সত্যেনদার অনুরোধে। ছফা ভাইকে খুব ভালোবাসেন। ছফা ভাই-ই আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। সত্যেনদা সেখান থেকে ওকে নিয়ে যাবেন শিল্পী হাশেম খানের বাসায়। তিনিই প্রচ্ছদ করে দেবেন।

রাস্তা খালি। কামালের বেশিক্ষণ লাগল না বাংলাবাজার পৌঁছুতে। সত্যেনদা দাঁড়িয়ে ছিলেন সিঁড়ির ওপর। সাইকেলটা দোকানের কর্মচারীর কাছে রেখে একটা রিকশা নিয়ে এলো গোপীবাগ। সত্যেনদাকে রিকশা থেকে নামালো কামাল। দরজা ধাক্কা দিতে লাগলেন সত্যেনদা। এক তরুণ, গোলগাল চেহারা, একমাথা কোঁকড়ানো চুল, সত্যেনদাকে দেখেই বললেন, 'আরে সত্যেনদা, এতো সকালে।'

'হাশেম আছ কেমন ? সুলায়মানের কী খবর বহুদিন দেখি না।'

'সব ভালো, আসেন আসেন।' পরে জেনেছিলো কামাল, সুলায়মান, অর্থাৎ ডা. সুলায়মান কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত। উদীচীর রিহার্সাল অনেক সময় এই বাসায় হয়। মতিউরের লাশ গোপীবাগে কবর দেয়ার যাবতীয় বন্দোবস্ত তিনিই করেছিলেন। আর কচি-কাঁচার মেলার মূল স্তম্ভ হলেন হাশেম খান। সত্যেনদা পরিচয় করিয়ে দেন। হাশেম খান, হেসে বলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওর নাম দেখেছি, কচি-কাঁচায় লেখে।'

সত্যেনদা বললেন, 'ওর বইয়ের প্রচ্ছদটা করে দিয়ে তো, প্রথম বই।'

'অবশ্যই অবশ্যই। আপনার আসার দরকার নেই। সামনে সপ্তাহে কামালই নিয়ে যাবে।

সত্যেনদাকে বাংলাবাজার নামিয়ে দিয়ে কামাল ছুটলো, ক্লাস আছে। সকালে নাস্তা খেয়ে বেরোয়নি। খিদেও লেগেছে। এগারোটার দিকে ক্লাস শেষ করে মধুর ক্যান্টিনে গেলো কিছু খাওয়ার জন্য। এক টেবিলে সংগ্রাম পরিষদ সমর্থকরা বসে আলাপ করছে। কামালও গেলো সেখানে । কারণ, কাদের নিশ্চিতভাবে এখানে আসবে।

ওদের আলোচনার মূল বিষয় ইয়াহিয়া এখন বিট্রে করবে। পাকিস্তান আর্মি কখনও সত্য কথা বলে না। ইতিমধ্যে ইয়াহিয়া ঘোষণা করেছেন ৫ অক্টোবর নির্বাচন হবে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। অর্থাৎ ১৮ বছরের বেশি যে কেউ ভোটার হতে পারবে, আগে সে নিয়ম ছিলো না। শুধু না, আরও স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে।

ছাত্ররা ব্যাপারটা পছন্দ করেনি। রাজনীতিবিদরা প্রায় সময় ক্ষুদকুড়ো পেলেই খুশি হয়। এ নিয়ে এক ধরনের টানাপড়েন চলছে।

এর মধ্যে এক কান্ড হয়ে গেছে। ৭ মার্চ ছিলো রেসকোর্সে শেখ মুজিবের জনসভা। কামাল যায়নি। আজকাল খুব দরকার না হলে মিটিং-মিছিলে যায় না। শেখ মুজিব আসলে নির্বাচনী প্রচার শুরুর জন্য সভাটি ডেকেছিলেন। বক্তৃতা শেষে তিনি বললেন, 'জয় বাংলা'! এর আগে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ছাত্রলীগের মিছিল থেকে স্লোগানটি উচ্চারিত হয়েছে। মানুষজন তখনও ব্যাপারটা ধরতে পারেনি। তিনি আবার স্লোগানের সুরে বললেন, 'জয় বাংলা!' রেসকোর্সের চারদিক এবার প্রকম্পিত হয়ে উঠলো একটি ধ্বনিতে- 'জয় বাংলা।' এরপর মিটিং-মিছিল সমাবেশ পারস্পরিক সম্বোধনে একটি শব্দই স্থান করে নিলো—'জয় বাংলা।' বাঙালি কি চায় তা যেন একটি শব্দেই অনুরণিত হতে লাগলো।

এভাবে আমরা জয় বাংলা শব্দটি পেয়েছিলাম।

৩০ মার্চের দিকে ইয়াহিয়া আবার আরেক ভাষণে 'লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার' ঘোষণা করলেন। এর আওতায় নির্বাচন হতে হবে। এই আইনটা ছিলো সংসদীয় শাসন কীভাবে খাটো করা যায় তার রূপরেখা। ছাত্ররা এখন আরও নিশ্চিত হয় যে ঝামেলা বাঁধবেই। ছাত্র সংগঠনগুলো তীব্রভাবে এর প্রতিবাদ জানিয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোও জানিয়েছে তবে অতটা জোরালোভাবে নয়। তারা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। শেখ সাহেব তো প্রচারণা শুরু করে দিয়েছেন। ছাত্রদের, রাজনৈতিক দলের অনেকের কাছে ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না। কামালের মনে হয়, রাজনীতি নিমিষে কাছে টেনে আবার নিমিষে দূরে ঠেলে দিতে পারে।

'ঐ যে লিডার আসছে,' কামাল ঠাট্টা করে বলে। দু'তিনজন জুনিয়রকর্মী নিয়ে কাদের ঢুকছে। তাদের জটলার কাছে এসে চেয়ার টেনে বসে বললো, 'জয় বাংলা'!

'কী লিডার এতো মানুষ মারা গেলো তারপরও তোমরা সব ভুলে খান সাহেবদের পা ধরে টানাটানি করছো কেন ?' কামাল ঠাট্টার সুরে কাদেরকে বলে আওয়ামী লীগকে ইঙ্গিত করে।

'কে কী করবে জানি না', বলে কামাল, 'বঙ্গবন্ধু বাংলার মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। তোরা তো ভাসাভাসা একতরফা শুনিস। অন্যদিকেরও তো ভার্সান থাকতে পারে। ওই দিন আমাদের বিভাগীয় কর্মিসভায় বঙ্গবন্ধু বলেছেন, ঝুঁকি নিতেই হবে। ১৯৭০ সালে নির্বাচনের সঙ্গে বাঙালি জাতির সম্মান জড়িত আর এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব আওয়ামী লীগকেই পালন করতে হবে।'

'পালন যথাযথভাবে করতে পারলেই হয়', ফোড়ন কাটলো একজন।

আড্ডা শেষে কামাল রওনা হলো আজাদের দিকে। প্রথমবার ভালো টাকা পেয়ে আম্মাকে কিনে দিয়েছে শাড়ি। পরের মাসে আব্বাকে পাঞ্জাবি। এরপর টাকা জমিয়েছে সাইকেলের জন্য। আর এই সাইকেল তাকে সুযোগ দিয়েছে যখন খুশি তখন এখানে সেখানে যাওয়ার।

'আজাদ' থেকে টাকা নিয়ে সে এই তপ্ত দুপুরে রওনা হলো বাংলাবাজারের দিকে। শামসুর রাহমানের নতুন ও পুরনো কয়েকটা কবিতার বই কিনবে। খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলো। ১৯৬০ সালে ছাপা তার প্রথম বই যা এখন বলতে গেলে দুষ্প্রাপ্য, নাম 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর' আগে। অন্যান্য কয়েকটি বইও কিনলো। তারপর গেলো পাটুয়াটুলির এক বাদ্যযন্ত্রের দোকানে। সেখান মাঝে-মাঝে কলকাতা থেকে

রেকর্ড আনা হয়। কামাল সংগীতপ্রেমী না হলেও এ এলাকায় যেহেতু তার আনাগোনা সেহেতু বিষয়টা জানে। দোকানে গিয়ে সে কয়েকটি রেকর্ডের মধ্যে দেবব্রত বিশ্বাসের একটি লং প্লেয়িং রেকর্ড কিনলো।

রাতে খেয়েদেয়ে সে গেলো দোলার বাসায়। দোলা তখন শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়ছে। কামাল তার নাম ধরে ডাকতেই উঠে বসলো। বললো, 'আয়'। কামাল ঘরে ঢুকলো। চাচী তখন রান্নাঘরে বাসনপত্র গুছাচ্ছেন। কামাল হাতে ধরা রেকর্ড পেছনে রেখে বললো, 'এই মেয়ে চোখ বন্ধ কর।'

'কেন ?'

'কর না।'

'করলাম।'

কামাল বললো, 'এই যে আমার ছোট্ট উপহার তোর জন্য।' রেডর্কটা তার হাতে ধরিয়ে দিলো,'তুই তো আমাকে সব সময় টাকার খোটা দিস। এটা নিজের টাকায় কেনা।'

দোলা চোখ খুলে রেকর্ডটি দেখলো। প্রথমে বিস্ময় তারপর তার চোখমুখে খুশির আভা ফুটে বেরুলো। 'সত্যি আমার জন্য।'

'হ্যাঁ তোর জন্য।'

দোলা তার দিকে তাকিয়ে রইলো। কামাল বললো, 'যাই, পরে দেখা হবে।' মন তার খুশিতে ভরে উঠেছে।

ঠ

ক্লাস শেষে কামাল মিলিকে বললো, 'মিলি তোমার সঙ্গে দরকার আছে।' এমন সিরিয়াস ভঙ্গিতে কামাল কথাটা বললো যে মিলি থমকে দাঁড়ালো। ক্লাসের ছেলে মেয়েরা বেরিয়ে গেছে। কামাল বইয়ের গোছাটা মিলিকে দিয়ে বললো, ' তোমার প্রিয় লেখকের দুটি বই।'

'কার ?'

'শামসুর রাহমানের। তাঁর প্রথম বইটাও আছে।'

'আমার জন্য ?'

'হ্যাঁ, তোমার জন্য।'

মিলি খুব অবাক হলো। বইগুলো ওল্টালো। গন্ধ শুকলো। বললো, 'কামাল সত্যিই তোমাকে ধন্যবাদ। আমি যে কী খুশি হয়েছি তোমাকে বোঝাতে পারবো না। চলো টিএসসিতে তোমাকে চা খাওয়াই।'

টিএসটিতে পৌঁছে দেখলো তার লেখক বন্ধুরা সব মিলে চা খাচ্ছে। কামাল সেদিকে পা বাড়িয়েছে। মিলি বললো, 'উহু ওই দিকে না। আমার সঙ্গে এসো। আমার সঙ্গে একলা চা খাবে।'

কুপন কিনে চা এনে দুইজনে খালি টেবিলে বসলো। মিলি বই দুটি উল্টে-পাল্টে দেখছে। বললো, 'কামাল কিছু লিখে দিলে না।'

লজ্জা পেল কামাল। বললো, 'কী লিখবো।'

'যা খুশি।'

কামাল দু'টি বইতেই লিখল 'মিলির জন্য'। মিলি, একটা বই উল্টে নিজ মনে একটি কবিতা আবৃত্তি করলো। কামাল বললো, 'আবৃত্তির অভ্যাসটা রেখো।'

তারপর পড়াশোনা নিয়ে কথাবার্তা। মিলি বললো, 'সামনে তো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমি বাড়ি যাব। তুমি ?'

কামাল জানালো, 'না, আমি ঢাকায়ই থাকব। বাড়ি তো গেলাম কয়েকদিন আগে। এখানে লেখালেখির কিছু কাজ আছে।'

এমন সময় হেলতে দুলতে শাহরিয়ার এলো। বললো, 'কী কামাল ফ্রি আছ নাকি ? চল আমার সঙ্গে।'

'কোথায় ?'

'আরে চলো না। গিয়াই দেখবা।'

মিলির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওরা দু'জন বেরুলো। শাহরিয়ার রিকশা নিতে চাইলো। কামাল বললো, 'আমার তো সাইকেল। তুমি বস। পয়সা বাঁচবে।'

সেগুন বাগানের খালের এক প্রান্তে নিয়ে এলো শাহরিয়ার। দোতলা সুন্দর বাড়ি। গেটে ঢোকার পর দেখল, বাড়ির এক প্রান্তে ছোট একটি ঘর। বাইরে লেখা 'ললনা।'

'আরে, এটি কী ললনা অফিস ?' কামাল জিজ্ঞেস করে।

মহিলাদের পত্রিকা হিসাবে ললনা তখন নাম করেছে। 'বেগম' ছেড়ে এখন অনেকে 'ললনা' পড়ে। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা। শাহরিয়ার বললো, 'এখানে কোনও ললনা নেই। আমরাই পত্রিকা চালাই।'

শাহরিয়ার প্রথম ঘরে ঢুকে ছোটখাটো এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললো, 'আখতার ভাই, তিনিই ললনার সব।' পাশের রুমে হাশেম খান, শাহাদত চৌধুরী, বেবী মওদুদ অনেকে বসে আছে। শাহরিয়ার বললো, 'আমার বন্ধু। আমাদের নতুন রিক্রুট।'

হাশেম খান, বললেন, 'আরে ওকে তো চিনি। কামাল, তোমার কভার নিয়ে গেছেন সত্যেন দা।'

'কীসের কভার', জিজ্ঞেস করে শাহরিয়ার।

'বইয়ের।' হাশেম খানের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

শাহরিয়ার ভেবেছে সত্যেন সেনের কোনো বইয়ের কভার হয়তো। সত্যেন সেনের সঙ্গে যোগাযোগ আছে তাঁর। সবাই জানে।

'লেখা শুরু করো।' বললেন শাহাদত চৌধুরী।

'লেখা ?' কামাল একটু অবাক হলো। সে মেয়েদের পত্রিকায় কী লিখবে ?

' আমরা সবাই মেয়েদের ছদ্মনামে লিখি। তুমিও একটা ছদ্মনাম নিয়ে নাও।'

সেই থেকে কামালের আরেকটি নতুন আস্তানা হলো 'ললনা'। জহরত আরা হক নামে সে নানা ফিচার লিখতে লাগলো। যদিও জহরত আরা ওরফে দোলাকে ব্যাপারটা জানায়নি।

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হলেও কামাল সকালে বেরিয়ে যায়। বাংলাবাজারে তার বইয়ের প্রুফ এসেছে। ছফা ভাই তাকে প্রুফ দেখা শিখিয়েছেন। প্রুফ দেখে কখনও আলী ইমামের বাসায় আড্ডা দেয়। দু'জন তারপর যায় দৈনিক ইত্তেফাক। কখনও একা কামাল চলে যায় ললনা অফিস। ইতিমধ্যে তারা সবাই ভোটার হয়েছে। দোলাও। কামাল-দোলা দুজনই প্রথম ভোটার।

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ দেখে ছাত্রদের কর্মকান্ড তেমন নেই। রাজনৈতিক দলগুলো মাঝে-মাঝে সভা সমাবেশ করে বিবৃতি দেয়। তবে, জয় বাংলা স্লোগানটা আজকাল প্রায়ই শোনা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে। ক্লাস এখনও ঢিলেঢালা। বাড়ি থেকে অনেকে ফেরেনি। শরীফ মিয়ায় ছফা ভাইয়ের সঙ্গে দেখা কামালের। বললেন, 'অ মিয়া চলো। আজ তোমার বই পাবে।'

'আমার বই আজ ?' কামাল থেমে থেমে জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ, তোমারই বই।' ছফা ভাই-ই আলিম সাহেবের প্রকাশনার দেখাশোনা করেন।

'আমার তো সাইকেল...' কী বলবে কামাল ভেবে পাচ্ছিলো না।

'তুমি সাইকেলে রওনা হও।' বললেন ছফা ভাই, 'আমি রিকশায় যাচ্ছি।'

দোকানে পৌঁছে দেখলো প্রকাশক, সত্যেনদা বসে আছেন। কিছুক্ষণ পর ছফা ভাইও ঢুকলেন। এরপর দশ কপি বই এনে কামালকে নাটকীয় ঢঙে দিয়ে বললেন, 'জনাব কামালউদ্দিন রহিম, আপনার প্রথম বই।'

সত্যেনদা ও আলিম ভাই হাততালি দিলেন।

কামাল এতো অভিভূত যে কী করবে ভেবে পাচ্ছিলো না। তার বন্ধুদের মধ্যে তার প্রথম বই বের হলো, তাও বের করেছে প্রকাশক। উদ্যোগী আহমদ ছফা ও সত্যেন সেন। সত্যিই তার কপাল!

বইগুলো সাইকেলের ক্যারিয়ারে রেখে কামাল ভাবলো প্রথমে কাকে বইয়ের খবরটা দেওয়া যায়। কী ভেবে সে রওনা হলো রহিম সাহেবের অফিসের দিকে।

রহিম সাহেব তখন ফাইল নিয়ে ব্যস্ত। কামাল কে হঠাৎ সামনে দাঁড়াতে দেখে ঘাবড়ে গেলেন। কামাল তো কখনও অফিসে আসে না। বাসায় কী কোনও অঘটন ঘটেছে, উদ্বেগের সুরে বললেন, 'কী বাবা, কী হয়েছে।'

'আমার বই বেরিয়েছে।' কামাল তার বইয়ের কপি এগিয়ে দিল।

'তোমার বই ?' রহিম সাহেব। খুব অবাক হলেন। সত্যিই তো কামালের বই। তিনি কিছু বলতে পারলেন না। উঠে দাঁড়িয়ে কামালের কাঁধে হাত রাখলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'কামাল, আমার খুশি... আমি যে কী খুশি হয়েছি বলতে পারবো না...' গলাটা ভেঙে এলো, 'আমার ছেলে লেখক।' কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তারপর বললেন, 'তোমার আম্মাকে আগে খবরটা দাও।'

কামাল বাসায় ফিরে আম্মার হাতে কপি তুলে দিলো। তিনি কামালকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'একটা কপি ভালো করে বাঁধিয়ে দিবি। শো-কেসে রাখবো।'

দুপুরে গেলো ললনায়। হাশেম খানকে এক কপি দিতে তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। কোথায় কোথায় রঙের ভুল হয়েছে তার বিবরণ দিয়ে বললেন, 'যাক মোটামুটি চলে, অভিনন্দন।'

শাহরিয়ার অত সবের মধ্যে গেলো না। কামালকে জড়িয়ে ধরে বললো 'বই যা হোক, বই তো, কাল সেলিব্রেট করতে হবে।'

'আজও খানিকটা হোক।' বলে পিয়ন ডেকে হাশেম খান চা-মিষ্টি আনতে বললেন।

চা-মিষ্টি আড্ডায় কেটে গেলো সময়। সন্ধ্যায় ফিরলো কামাল। সাইকেল সিঁড়ির গোড়ায় রেখে দোলাদের দরজায় কড়া নাড়লো। যথারীতি

চাচি দরজা খুলে দিলেন। কামাল দোলাকে নাম ধরে ডেকে তার দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। ভেতর থেকে দোলা বললো, 'আয়।'

কামাল ঘরে ঢুকে একটা বই এগিয়ে দিলো দোলার দিকে। দোলা প্রথমে বুঝতে পারে নি। পরে ভালোভাবে মলাটটা দেখে খুশিতে বললো, 'আরে তোর বই বেরিয়েছে,' উচ্ছ্বাসে সে কামালকে জড়িয়ে ধরলো, মুহূর্তে অপ্রস্তুত হয়ে এক পা পিছিয়ে এসে বললো, 'আমাকে বলিস নি কেন আগে।' তারপর দরজার দিকে এগিয়ে চিৎকার করে বললো, 'আম্মা আম্মা দেখ। কামালের বই বেরিয়েছে।' চাচি বই প্রকাশের গুরুত্ব তেমন না বুঝলেও বুঝলেন ভালো কিছু একটা হয়েছে। কামালের মাথায় হাত রেখে বললেন, 'বেঁচে থাক বাবা বেঁচে থাকো।'

সকাল সকালই কামাল গেলো কাদেরের বাসায়। বন্ধুর কৃতিত্ব যেন তারই কৃতিত্ব কাদেরের ভাবটা এমন। সকাল এগারোটার ক্লাস ছেড়ে বেরুবার পর দেখলো কাদের আট-দশজনকে নিয়ে অপেক্ষা করছে। অনিল, জাহিদ, ওবায়েদ, মিলি, ফাতেমা, নীলা ছাড়াও মুখচেনা আরও কয়েকজন আছে। কাদের বক্তৃতার ঢঙে বললো, 'আমাদের এই বন্ধুটিকে আপনারা চেনেন, সে আজ অত্যন্ত কৃতিত্বপূর্ণ একটি কাজ করেছে যা আমরা করতে পারিনি। অতএব আমরা তার জন্য কী করতে পারি।'

'শোন বন্ধুগণ,' বললো অনিল, 'কামালের প্রথম চালানের বইগুলো কিনে আমরা তাকে সম্মানিত করতে পারি।'

'পার কপি কত ?' তারপর জিজ্ঞেস করে অনিল।

'দুই টাকা,' কামালের হাতে গোটা আটেক কপি ছিলো, বন্ধুদের দেবে বলে এনেছিলো। কাদের আট জনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ষোল টাকা তুলে দিলো কামালের হাতে।

'প্রিয় বন্ধুরা,' বললো, 'তোমরা আমাকে যে সম্মান জানিয়েছ সেটি আমার জীবনে ভুলে যাওয়া কষ্টকর হবে। আমি এই টাকা দিয়ে শরীফ মিয়ায় তোমাদের বিরিয়ানি খাওয়াতে চাই।'

'হুররে, এই তো বন্ধুর মতো কথা,' বললো নীলা। দলবেঁধে তারা রওয়ানা হলো শরীফ মিয়ার দিকে। মিলি কামালের হাত ধরে টেনে, গলা নিচু করে বললো, 'দুপুরে আমি তোমাকে একা টিএসসিতে খাওয়াবো। ঠিক দেড়টায় চলে এসো, মনে থাকে যেন।'

কামাল বুঝতে পারছিলো না আজ কেন তার সব কিছু সুন্দর লাগছে। কেন মনে হচ্ছে বেঁচে থাকাটা মন্দ নয়।

ক্লাস, লেখালেখি, আড্ডা, দিনগুলো কেটে যাচ্ছে।

ড

ক্লাস, লেখালেখি, আড্ডা, দিনগুলো কেটে যাচ্ছে। সব ঠিকঠাক থাকলে সামনের বছরের মধ্যেই অনার্স শেষ হয়ে যাবে। দোলাকে একদিন বলছিলো কামাল, 'সামনের বছর তো তুইও পাস করে যাবি। তাহলে একসঙ্গে যাওয়া যাবে ইউনিভার্সিটি।'

'এক বছর অনেক দিন', বলেছিলো দোলা, 'মানুষের জীবনে যে কখন কী ঘটে তা কেউ জানে না। আর জানে না দেখেই বোধহয় সে বেঁচে থাকে।'

নির্বাচনী প্রচার খানিকটা শুরু হয়েছে। চারদিকে আওয়ামী লীগের মার্কা নৌকার কথাই শোনা যাচ্ছে। কেউ কেউ ন্যাপের কুঁড়েঘরের কথাও বলে। শেখ মুজিব মনে হয় নির্বাচনের বিষয়টা সিরিয়াসলিই নিয়েছেন।

১১ নভেম্বর সকাল থেকে রেডিওতে বারবার ঘোষণা করা হচ্ছিল নিম্নচাপ ঘনীভূত হয়ে উপকূলের দিকে এগোচ্ছে। যতই বেলা বাড়তে

থাকলো ততই ঘোষণা ঘন ঘন হতে লাগলো। একটা সময় ১০ নম্বর বিপদ সংকেতের কথা ঘোষণা করা হলো, ঢাকার আকাশটা মেঘলা হয়ে আসছে। একটু-আধটা বৃষ্টিও হচ্ছে। তবে চারদিকে একটা থমথমে ভাব। রাতের পর ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানলো উপকূলে।

রেডিওর খবরে তখনও বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। ১২ তারিখের খবরের কাজেও তেমন কিছু ছিলো না। ১৩ তারিখ থেকে যেসব সংবাদ ও ছবি প্রকাশিত হতে লাগলো তা আর বলার নয়। ভূঁইয়া ইকবাল চট্টগ্রাম যাবার সময় কামালকে জিজ্ঞেস করেছিলেন সে যাবে কি না। নিউজ এডিটর জানালেন দু'জন চলে গেছে। আর দরকার নেই। ইকবাল ভাইয়ের যেসব রিপোর্ট ছাপা হতে লাগলো দৈনিক পাকিস্তানে তা দেখে কামালের একবার মনে হলো তারও যাওয়া উচিত ছিলো। ১০ লাখ মানুষ মারা গেছে। ঘরবাড়ি ছাড়া আরও কোটিখানেক। ত্রাণ নেই, আর্ত এলাকায় যাওয়ারও উপায় নেই। কামাল কাদের ঠিক করলো পল্টন ও সেগুনবাগিচা এলাকায় তারা ত্রাণ জোগাড় করবে তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেবে। সেখানে একটি কেন্দ্রীয় ত্রাণভান্ডার খোলা হয়েছে।

অনিল, জাহিদ, দোলা, কামাল, মিলি, কাদের, নীলা, ফাতেমা ও পাড়ার কয়েকজনকে নিয়ে প্রতিদিন তারা নিয়মিত যেতে থাকলো মহল্লায়। পয়সা-কড়ি, কাপড়-চোপড়, চাল যে যা দিলেন তাই তারা নিলো। এক সপ্তাহের মতো কাজ করলো তারা।

এরই মধ্যে নির্বাচন পেছাবার কথা উঠছে। সবচেয়ে বড় কথা, এতো বড় একটা ঝড় হয়ে গেলো, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কেউ তৎক্ষণাৎ এলো না। না, স্বায়ত্তশাসন ছাড়া উপায় নেই। সাধারণের মনে শেখ মুজিবের ৬ দফা আরও দাগ কেটে গেলো।

নির্বাচন ডিসেম্বরে পেছানো হলেও মওলানা বললেন, নির্বাচন করা যাবে না। মুজিব নির্বাচনে রাজি। সব মিলিয়ে আবার যেন সবখানে রাজনীতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগলো।

৩০ নভেম্বর ন্যাপ (ভাসানী) এক প্রচারপত্র বিলালো। বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে কামালও একটি জোগাড় করলো। 'জনগণের প্রতি মওলানা ভাসানীর ডাক পূর্ব পাকিস্তানের আজাদী রক্ষা ও মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ুন।' ইশতেহারের শেষে পাকিস্তান নয়, 'পূর্ব পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ও 'ইঙ্গ-মার্কিন দস্যুরা-বাংলা ছাড়' লেখা। সারাদিন এই ইশতেহার নিয়ে আলোচনা। হুজুর

কী তাহলে পরোক্ষে মুজিবকেই সাপোর্ট দিচ্ছেন। কিন্তু শেখ মুজিবের নির্বাচন নিয়ে পড়ে থাকা অনেকের পছন্দ হচ্ছিলো না।

৪ ডিসেম্বর মওলানা পল্টনে জনসভা ডাকলেন। বহুদিন পর ভাসানীর জনসভা। এতবড় বিপর্যয় ঘটে গেছে, তার ওপর সামনে নির্বাচন, কী বলবেন হুজুর। বিকেলের আগেই পল্টন ভরে উঠলো। সন্ধ্যার আগে সাদা পাঞ্জাবি পরে মওলানা ভাসানী উঠলেন বক্তৃতা দিতে। জ্বালাময়ী ভাষায় সাইক্লোনের দুর্দশাগ্রস্থদের কথা বললেন, তারপর পশ্চিমে হাত উঠিয়ে বললেন, 'ওরা কেউ আসেনি।' এই তিনটি শব্দ বাংলার মানুষ অনেকদিন মনে রেখেছিলো। জনসভার পরদিন কামাল বলেছিলো কাদেরকে এই তিনটি শব্দ দিয়ে মওলানা ২৪ বছরের লাঞ্ছনা-শোষণ বুঝিয়ে দিতে পেরেছিলেন। ওই দিনের বক্তৃতায় মওলানা সাহেব আরেকটি কথা বলেছিলেন—"মুজিব তুমি স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান সংগ্রামে যোগ দাও। যদি আমেরিকা ও ইয়াহিয়ার স্বার্থে কাজ করো তাহলে আওয়ামী লীগের কবর ১৯৭০ সালে অনিবার্য।"

মানুষজন মনে ক্ষোভ আর ক্রোধ নিয়ে ফিরেছিলো। কামালের সঙ্গে সে দিন মিটিংয়ে গিয়েছিলো ওবায়েদ। প্রায় বছরখানেক পর মওলানা সাহেবের মিটিং দেখেই কামাল গেছিলো। ওবায়েদ বললো, 'হুজুর তো এখন পূর্ব পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলছেন। বল এখন শেখ মুজিবের কোর্টে।'

'কথাটা ঠিক,' বললো কামাল, 'অনেকেই তো সন্দেহ করছে হয়ত তিনি আপস করবেন। সে জন্যই হয়ত মওলানা সাহেব তাঁকে আহ্বান জানাচ্ছেন স্বাধীনতার জন্য।'

বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচনাটা এখন এ নিয়েই হয়। ১০ লাখ মানুষ মারা গেলো অথচ পাকিস্তান সরকার কেয়ারই করলো না। তারা আমাদের যদি মানুষ না মনে করে তাহলে তাদের সঙ্গে থেকে লাভ কী ?

কাদের একদিন আওয়ামী লীগের এক প্রচারপত্র নিয়ে হাজির। প্রায় চারপাতা। কাদের বললো, 'মওলানা সাহেব ঘোষণা করলেন ৪ তারিখ আর বঙ্গবন্ধু তো ১ তারিখেই তার কথা বলে দিয়েছেন। এই দেখ—' বলে কামালের হাতে দিলো প্রচারপত্রটি।

কামাল পড়তে লাগলো। দুই অঞ্চলের বৈষম্যের কথা আলোচনা করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু বলেছেন, "আমি ক্ষমতার প্রত্যাশী নই।' কিন্তু যে অনুচ্ছেদটি কামাল দুবার পড়লো তা হলো—

"কোন নেতা নয়, কোন দলপতি নয়, আপনারা—বাংলার বিপ্লবী, ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক ও সর্বহারা মানুষ রাতের অন্ধকারে কারফিউ ভেঙে মনু মিয়া, আসাদ, মতিউর, রুস্তম, জহুর, দোহা, আনোয়ারের মতো বাংলাদেশের দামাল ছেলেমেয়েরা প্রাণ দিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলে আমাকে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কবল থেকে মুক্ত করে এনেছিলেন। সে দিনের কথা আমি ভুলে যাইনি, জীবনে কোনোদিন ভুলব না, ভুলতে পারবো না। জীবনে আমি যদি একলাও হয়ে যাই, মিথ্যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মতো আবার যদি মৃত্যুর পরোয়ানা আমার সামনে এসে দাঁড়ায়, তাহলে আমি শহীদের পবিত্র রক্তের সঙ্গে বেঈমানি করব না। আপনারা যে ভালোবাসা আমার প্রতি অক্ষুণ্ন রেখেছেন, জীবনে যদি কোনোদিন প্রয়োজন হয় তবে আমার রক্ত দিয়ে হলেও আপনাদের এ ভালোবাসার ঋণ পরিশোধ করব।"

একদম শেষে লিখেছেন, আমি জানি, ৬ দফা ও ১১ দফা বাস্তবায়নের পরই তাদের বিদেহী আত্মা শান্তি পাবে। কাজেই আপনারা আওয়ামী লীগের প্রতিটি প্রার্থীকে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে বাংলাদেশে প্রতিটি আসনে জয়যুক্ত করে আনুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে জালেমদের ক্ষুরধার নখদন্ত জননী বঙ্গভূমির বক্ষ বিদীর্ণ করে তার হাজারও সন্তানকে কেড়ে নিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরা জয়যুক্ত হব।"

কামাল পড়া শেষ করলো।

'কী বুঝলি ?' কাদের জিজ্ঞাসা করে।

'এবারের ভোট ৬ বা ১১ দফার ওপর। যদি বঙ্গবন্ধু জিতেন তাহলে তাঁকে স্বায়ত্তশাসন এনে দিতেই হবে। এখন আমাদের স্পষ্ট হ্যাঁ অথবা না করতে হবে।'

নির্বাচনী হাওয়া লেগেছে। ১০ লাখ মানুষ হারিয়ে যাওয়ার পরও। এ ধারণা জন্মেছে এর প্রতিশোধ ভোটের মাধ্যমেই নিতে হবে। মহল্লায় মহল্লায় শোনা যাচ্ছে 'নৌকার পালে হাওয়া লেগেছে। আর ঠেকায় কার সাধ্য।'

৭ ডিসেম্বর এসে গেলো। পল্টনেই কামালদের ভোট কেন্দ্র। সকালেই দুই পরিবারের ছয় সদস্য ভোট দিতে বেরিয়ে যায়। বিরাট লাইন। কিন্তু বিশৃঙ্খলা নেই। লাইনে দাঁড়াতে দাঁড়াতে কামাল বলে দোলাকে, 'কোথায় ভোট দিবি ?'

'তোকে কেন বলবো ?' উত্তর দেয় দোলা।

'নৌকায় ভোট দিস,' বলে কামাল, 'আমাদের অনেক কিছু নির্ভর করবে এর ওপর।'

দোলা জবাব দেয় না।

ভোট দেওয়ার পর দুই বাসার মুরব্বিরা বাড়ি ফিরে গেলেও কামাল আর দোলা ঘুরে বেড়ায় দুপুর পর্যন্ত। কামাল একবার ভেবেছিলো হলে যাবে। কিন্তু অনিল, জাহিদ বাড়ি গেছে ভোট দিতে। কাদের আছে, কিন্তু তাকে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ।

সন্ধ্যা হতেই দেখা যায় ঢাকা শহরের প্রতিটি বাড়িতে মানুষ সপরিবারে ট্রানজিস্টরের সামনে। একটু রাতের দিকে বেশ কিছু আসনের ফল পাওয়া যায়।

প্রথম আসনই আওয়ামী লীগের। স্লোগান শোনা যায় রাস্তা থেকে। কামালদের বাসায় চলে এসেছেন খাওয়া-দাওয়ার পর হক চাচা, চাচি ও দোলা। একি প্রতিটি আসনই তা জাতীয় হোক বা প্রাদেশিক হোক জিতেছে নৌকা। হক সাহেব খুশিতে বলে ফেলেন, 'কিস্তি মাত। এবার দেখা যাবে ব্যাটারা কী করে।' রাত বাড়তে থাকে। সেই একঘেঁয়ে ঘোষণা। আওয়ামী লীগের প্রার্থীরাই জিতেছে। রাত একটার সময় হক সাহেব বললেন, 'না যাই, কাল একটু পুষ্ট হয়ে অফিসে যেতে হবে।' তারা চলে গেলে কামালও শুতে চলে যায়। রাস্তায় রাস্তায় তখনও শোনা যাচ্ছে ট্রানজিসটারের শব্দ।

কামালের উঠতে একটু দেরি হয়েছিলো। কাদেরের হইচইয়ে ঘুম ভাঙলো। সকাল মাত্র ৮টা। কাদের কামালের আম্মাকে বলছে, 'চাচি ভালো করে নাস্তা খাওয়ান। এমন খুশির দিন আসবে না।' কামাল চোখ ডলতে ডলতে খাবার ঘরে এসে বললো, 'এত হুল্লোড় করছিস কেন ?'

কাদের আয়েস করে বসলো, 'এ বেটা তুই এখন ক্ষমতার অংশীদার। ৫শ বছরে এই প্রথম বাঙালি যুদ্ধ না করেই জিতেছে।'

কামাল তখনও ব্যাপারটা ধরতে পারেনি।

'ন্যাশনাল এসেম্বলির পূর্ব পাকিস্তানের ১শ ৬২টি সিটের মধ্যে আওয়ামী লীগ পেয়েছে ১শ ৬০টি। আর প্রভেনসিয়াল এসেম্বলির ৩শটির মধ্যে আওয়ামী লীগ পেয়েছে ২শ ৮৮টি।'

'কিন্তু ভুট্টো ?'

'ভুট্টো সব মিলিয়ে পেয়েছে ৮৩টি। মহিলাদের ধরলে ৮৮টি। আর আওয়ামী লীগের মহিলাদের ধরলে ১শ ৬৭টি। কী বুঝলি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এখন এই দেশের ভবিষ্যৎ প্রাইম মিনিস্টার।'

'হতে দেবে তো ?' কামাল সন্দেহ প্রকাশ করে হাত-মুখ ধুতে যায়।

ঢ

যেখানে যাও সেখানেই এক ধ্বনি—'জয় বাংলা।' এর সঙ্গে যোগ হয়েছে নতুন আরেকটি স্লোগান 'পদ্মা মেঘনা যমুনা তোমার আমার ঠিকানা।' কামাল লক্ষ্য করে, পাকিস্তান শব্দটি যেন মানুষ ক্রমেই ভুলে যাচ্ছে। ইসলামের কথাও আর লোকজন তেমন বলে না, এমনকি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানও নিশ্চুপ। শেখ মুজিবের জয়ে সারা পাকিস্তান স্তম্ভিত হয়ে গেছে। দালালি করে যারা সব সময় কথা বলে তারাও নিশ্চুপ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস হয় বটে তবে সবখানে আলোচনা কী হবে ? শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী না করে কী অন্য কোনও খেলা হবে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এলেন জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি। মানুষজন অস্থির হয়ে আছে। হেয়ার রোডের বাড়িতে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বললেন বঙ্গবন্ধু। প্রেসিডেন্ট ইসলামাবাদ রওনা হওয়ার আগে সাংবাদিকদের শেখ মুজিবকে দেখিয়ে বললেন, 'ফিউচার প্রাইম মিনিস্টার অব পাকিস্তান।'

এদিকে বক্তৃতা বিবৃতি চলছেই, কামাল ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো একুশের সংকলন বের করার জন্য। এবারের সংকলনটা ভালোভাবে করতে চায়। সে নিজেই সম্পাদনা করবে। কবিতা, প্রবন্ধ সংগ্রহ ও ছাপার কাজে এতো ব্যস্ত ছিলো যে, এরই মাঝে ঢাকায় এসে ভুট্টো চলেও গেলেন তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। ইয়াহিয়া খানও নীরবতা ভেঙে ঘোষণা করলেন ৩ মার্চ ঢাকায় অধিবেশন বসবে।

গুজব শোনা যাচ্ছিলো, শেখ মুজিবকে ক্ষমতা দেওয়া হবে না। ভুট্টো উল্টাপাল্টা কথা বলছেন। তা নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানেও অনেকে ক্ষুব্ধ। লাহোরে জনসভায় তিনি ঘোষণা করেছেন, যারা ঢাকায় যাবে তাদের ঠ্যাং ভেঙে দেবেন। লারকানায় তার জমিদারিতে ইয়াহিয়া শিকারেও গেছেন।

২১ জানুয়ারি খুব সকালে দোলাকে নিয়ে গিয়েছিলো কামাল শহীদ মিনারে। আগেই তার বন্ধুদের বলে রেখেছিলো স্মরণিকা বিক্রিতে সাহায্য করতে হবে। অনিল, মিলি এরা অনেকেই কামালের কাছ থেকে ১০-৫টা স্মরণিকা নিয়ে বিক্রির চেষ্টা করছে। প্রায় সারাদিন ওরা শহীদ মিনারে ছিলো। বিভিন্ন দলের কাছ থেকে নানা কথা শুনে বোঝা গেলো নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় যাওয়া যতটা সহজ ভাবা হয়েছিলো তা এতো সহজ না। কারণ ভুট্টো ইতিমধ্যে দুই প্রধানমন্ত্রীর ফর্মুলাও দিয়েছেন। এতে মানুষজন আরও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে। ছাত্রদের অনেক কষ্টে লিডাররা নিয়ন্ত্রণে রাখছেন।

কাদের কামালকে বলেছিলো, 'বঙ্গবন্ধু বলেছেন ওরা উস্কানি দেবে। কিন্তু আমাদের শান্ত থাকতে হবে।'

ঢাকা স্টেডিয়ামে কমনওয়েলথ একাদশের সঙ্গে পাকিস্তানের খেলা হবে। কামাল খেলাধুলায় খুব একটা উৎসাহী না। জাহিদই সবাইকে উস্কালো, 'চল খেলাটা দেখি।' কারণ এক বাঙালি রকিবুলকে খেলায় নেওয়া হয়েছে।

'এখানেও দেখ হারামিপনা,' জাহিদ যে খেলাধুলায় একটু আগ্রহী বলছিলো, 'কোনও বাঙালি খেলোয়াড়কে তারা চান্স দেয় না। আমাদের রকিবুল চান্স পেয়েছে, এটা মিস করি কীভাবে'।

কামালরা জেনে নিয়েছিলো খোঁজ-খবর নিয়ে রকিবুল ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছে। মিলি, কাদের, জাহিদ, অনিলের টিকিট করা হয়েছে। কামাল নিজের টাকার সঙ্গে দোলার জন্য একটা টিকিটেরও টাকা দিয়েছে।

১ তারিখ সকাল থেকেই তোড়জোড়। দোলা স্যান্ডউইচের প্যাকেট আর পানির বোতল নিয়েছে। সবাই এসে স্টেডিয়ামের গেটে একত্রিত হলো। গ্যালারিতে একসঙ্গে সবাই বসেছে খেলা দেখতে। এর আগে কামাল একদিন এসেছিলো। সবাই সিজন টিকিট করলেও আজকে শেষ দিন দেখে সবাই এসেছে।

গ্যালারি ভর্তি। বোঝা যাচ্ছে খেলা ড্র হবে। অনেকে ট্রানজিস্টর নিয়ে এসেছে। খেলা দেখতে দেখতে একই সঙ্গে ধারা বিবরণী শুনছে। এর আগের দিন জাহিদ এসেছিলো রকিবুলের খেলা দেখতে। রকিবুল ওপেন করেছিলো। ব্যাট করতে নামার সময় ব্যাটটা ঘুরিয়ে সবাইকে দেখিয়েছিলো। জাহিদ পরে শুনেছে ওর ব্যাটে 'জয় বাংলা' লেখা একটা স্টিকার লাগানো ছিলো। এক রান করেছে রকিবুল। কিন্তু সে খেলছে এতেই সবাই খুশি।

দুপুর নাগাদ সবাই বুঝে গেছে খেলা ড্র হবে। ওদের উৎসাহ কমে আসছে। অষ্টম জুটিতে ওয়াসিম আর সরফরাজ খেলছে। কাদের বলে, 'ইনিংসটা শেষ হলে চলে যাবো।'

কাদেরের কথা শেষ হয়নি কী হয়নি, মাঝখানের গ্যালারি থেকে হঠাৎ একদল দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার করে বলতে লাগলো 'মানি না, মানি না।' চারদিকে হুড়োহুড়ি। ওরা উঠে দাঁড়িয়েছে। দোলা আর মিলি ভয় পেয়েছে। কামাল বললো 'নড়ো না।' এরপর দেখা গেলো চারদিক থেকে হইচই আর স্লোগান। জানা গেলো ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত

ঘোষণা করেছেন। একদল গ্যালারি টপকে মাঠে ঢুকতে গেলো, পুলিশ বাধা দিয়ে পারছে না। গ্যালারির বিভিন্ন জায়গায় খবরের কাগজ জ্বেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। খেলোয়াড় আম্পায়ার সব মাঠ ছেড়ে প্যাভিলিয়নের দিকে দৌড়াচ্ছে। গ্যালারি থেকে হুড়মুড় করে লোকজন নামছে। কাদের আগে, তারপর মিলি আর দোলা, পেছনে কামাল। এভাবে তারা ভিড় ঠেলে এগুচ্ছে। দোলা মিলির হাত চেপে ধরে রেখেছে। গেট দিয়ে বেরিয়ে জিন্নাহ অ্যাভিনিউতে পড়লো তারা। চারদিকে লোকজন ছোটাছুটি করছে। 'জয় বাংলা'। আরেক দল বলছে 'পদ্মা মেঘনা যমুনা তোমার আমার ঠিকানা।' সেটি থামতে না থামতেই স্লোগান 'জাগো জাগো বাঙালি জাগো।'

কামাল দোলাকে বললো, 'তুই বাসায় যেতে পারবি না। চলে যা আমরা একটু পরে আসছি।'

মিলিকে কাদের বললো, 'মিলি তুমিও হলে চলে যাও, কখন কী হয় জানি না, পরে দেখা হবে।'

মিলি দোলাকে বললো, 'চল তোমাকে একটু এগিয়ে দিই। তারপর রিকশা নেবো।'

গুলিস্তানের মোড়ে ভিড়। একজন ঘোষণা করলেন, বিকেলে পল্টনে জনসভা হবে। মিছিল করেও অনেকে স্লোগান দিচ্ছে। কিন্তু কী করবে বুঝতে পারছে না। হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে কে একজন বললো, 'বঙ্গবন্ধু পূর্বাণী হোটেলে'। 'চলো চলো' রব উঠলো। অনেকে ছুটতে লাগলো সে দিকে।

কামালরা পূর্বাণীর সামনে এসে দেখলো প্রচন্ড ভিড়। আওয়ামী লীগের মিটিং চলছিলো। সবাই বঙ্গবন্ধুর কথা শুনতে চায়। সাংবাদিকরাও ভিড় জমিয়েছেন। খবর পেয়ে এক সময় বঙ্গবন্ধু বেরুলেন। হাতে পাইপ, মুখ গম্ভীর। জনতা স্লোগান দিলো 'জয় বাংলা'। তিনি হাত তুলে সবাইকে শান্ত হতে বললেন, সাংবাদিকরা প্রশ্ন শুরু করলেন। গম্ভীর মুখে তিনি উত্তর দিচ্ছেন। কামালরা শুনতে পাচ্ছে না বটে কিন্তু প্রশ্নোত্তর রিলে হয়ে সবার কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। একজন সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলেন, 'জনগণ আপনার নির্দেশ চায়। তাদের জন্য আপনার নির্দেশ কী ?'

'সাতই মার্চ জানতে পারবেন। তবে আমরা এটাকে বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দেবো না।' জবাব দিলেন গম্ভীর বঙ্গবন্ধু। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে জানানো হলো আগামীকাল ঢাকায় হরতাল, পরদিন পুরো দেশে।

মানুষজন আবার ফিরতে শুরু করেছে। অনেকে মিছিল করে ফিরছে। কাদের বললো, 'খিদে পেয়েছে খুব। কোথায় খাওয়া যায়।'

'চল রেক্সে,' বললো অনিল।

'রেস্ত আছে,' জিজ্ঞেস করে জাহিদ।

'কার পকেটে কত আছে বের করো,' বলে কাদের। চারজনের টাকা-পয়সা গুনে ঠিক হয় চারটে পরোটা একটা কাবাব হবে, তাই সবাই ভাগ করে খাবে।

রেক্সের ভেতরও তুমুল আলোচনা। তারা খাওয়া-দাওয়া শেষ করে কথা বলছে। এমন সময় একজন এসে খবর দিলো, 'মুসলিম লীগের সবুর খানও পদত্যাগ করেছেন।'

'হচ্ছেটা কী ?' বলে অনিল।

'আমার মনে হয়' কাদের একটু ভেবেচিন্তে বলে, 'রাজনীতিবিদরা বুঝতে পারছেন বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতা করলেই মানুষজন এখন ছিঁড়ে খাবে। আফটার অল রাজনীতি করে মানুষের পালস তো বুঝতে পারে।'

'সবই বুঝলাম, কিন্তু সবশেষে হবেটা কী ?' কামাল প্রশ্ন করে।

'সেই আন্দোলন,' জাহিদ বলে, 'তবে, এবার মনে হয় আমাদের কথা শুনতে হবে।'

'আচ্ছা, পাকিস্তান শব্দটা হঠাৎ উঠে গেলো দেখেছিস,' অনিল বলে, 'স্লোগানের ধরন দেখেছিস, সব বাঙালি হয়ে যাচ্ছে।'

'আগামীকাল কী করবো ?' জিজ্ঞেস করে কামাল।

'আগামীকাল হরতাল,' বলে কাদের, 'কিন্তু কলাভবন যাবো। আবার ঊনসত্তরের ফেব্রুয়ারি ফিরে এলো রে।'

সন্ধ্যার মুখোমুখি তারা উঠলো। অনিল আর জাহিদ জিপিওর সামনে দিয়ে হলের দিকে রওনা দিলো। কামাল আর কাদের তোপখানার দিকে।

'কাল ৯টার মধ্যে চলে আসিস,' কাদের বললো, 'খুব সম্ভব ১১টায় মিটিং হবে কলাভবনে।' বিদায় নিয়ে কাদের সেগুনবাগিচার দিকে মোড় নেয়।

ণ

রাতটা কেটেছে উত্তেজনায়। সন্ধ্যায় যখন কামাল ফিরেছে তখন দেখে হক চাচার বারান্দায় আব্বা, হক চাচা ও তাদের অফিসের দু'জন বন্ধু আলোচনা

করছেন, কামালকে দেখে হক চাচা জিজ্ঞেস করলেন, 'কামাল নতুন কোনো খবর আছে।'

'এখনও কোনো খবর পাইনি। তবে আগামী দু'দিন দুপুর পর্যন্ত হরতাল।'

বিছানায় শুয়েও ঘুম আসে না। মাঝ রাতের পর ঘুমালো কামাল। সকালে বেরুবে ঠিক করেছে, আব্বা বললেন, 'তুই যাচ্ছিস কোথায় ? আমরাও তো বেরুচ্ছি না। দুপুরের পর বেরুব।'

'আমি খালি ইউনিভার্সিটিতে যাবো আর আসবো।' বলে কামাল দরজার দিকে রওনা হলো চা না খেয়েই। পাছে আব্বা আটকে দেন।

বাইরে এসে দেখে হরতাল মানে হরতাল। একটি রিকশাও নেই। কাদের অপেক্ষা করছিলো। দুজনে দশটা নাগাদ পৌঁছাল কলাভবনের সামনে। এরই মধ্যে কলাভবনে ছাত্রছাত্রী মানুষজনের ভিড়। অনেকের হাতেও আবার লাঠি। ছোট ছোট মিছিল আসছে হল থেকে। একটি মিছিলের সামনে মিলি। মিছিল কলাভবনের সামনে এসে শেষ হলো। কাদের মিলিকে ডেকে নিলো। তারা তিনজন একপাশে দাঁড়ালো। কী হবে কেউ জানে না। একজন খবর দিলো কাদেরকে স্বাধীন বাংলার পতাকা ওড়ানো হবে। গত রাতে ইকবাল হলে পতাকা তৈরি হয়েছে। খবরটা সবাইকে রোমাঞ্চিত করে তুললো। মিলি বললো, 'একদিনে আবার সব পাল্টে গেলো।'

'সবাই এখন স্বাধীনতার কথা বলছে।' বললো, কামাল, 'ছয় দফার কথাও তো কেউ বলছে না।'

এগারোটা পর্যন্ত কেউ বসে থাকতে রাজি নয়। সাড়ে দশটায়ই মিটিং শুরু হলো। কে শোনে কার কথা। ক্ষণে ক্ষণে স্লোগান উঠছে, 'তোমার দেশ আমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ' 'তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব শেখ মুজিব।' বাংলাদেশ শব্দটি শুনে নিজের অজান্তেই কামাল আর মিলি গলা মিলিয়েছে। ছাত্রলীগ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ আর ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখনও সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিলেন। এরপর দেখা গেলো কলাভবনের পোর্টিকোর ওপর উঠে দাঁড়িয়েছেন ডাকসুর ভিপি আ স ম আবদুর রব। কয়েকজন মিলে তাকে একটি বাঁশ এগিয়ে দিচ্ছে। বাঁশের ডগায় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। সবুজ পটভূমিতে লাল সূর্য। তার মাঝে সোনালী রঙে পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্র। যা এখন থেকে বলা হবে বাংলাদেশের মানচিত্র। হাততালিতে পুরো কলাভবন কেঁপে উঠলো।

অনেকের চোখে পানি। এমন সময় একজন দৌঁড়ে ভিড়ের মধ্যে ঢুকলো। তার জামায় রক্তের লাল ছিটে। উত্তেজিত গলায় বললো 'ফার্মগেটে গুলি হয়েছে।' মুহূর্তে মিটিং শেষ। লাঠি হাতে কলাভবনের গেট দিয়ে মিছিল বেরুলো। মিছিল ছুটছে বায়তুল মোকাররম মসজিদের দিকে। কামাল আর কাদেরও ছুটছে। মিলি হারিয়ে গেছে ভিড়ে। ঊনসত্তরের উত্তেজনা মিছিলে।

কামাল দুপুরে বাসায় খেয়ে-দেয়ে হরতাল ভাঙার পরই 'আজাদে'র দিকে রওনা হলো। আজকের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের রিপোর্টটা করতে চায়। পত্রিকার কাজ শুরুর আগে ভাগে পৌঁছেই সে লেখা শুরু করেছে। এমন সময় জানা গেলো, শহরের বিভিন্ন জায়গায় গোলমাল হয়েছে। দুজন নিহত ও কয়েকজন আহত হয়েছে। রামপুরায় ছাত্রনেতা ফারুক ইকবালকে সেনাবাহিনী গুলি করে মেরে ফেলেছে। কার্ফু ঘোষণা করা হয়েছে সন্ধ্যা থেকে। কামাল তাড়াতাড়ি লেখা শেষ করে জমা দিতে গিয়ে দেখলো বার্তা সম্পাদক গভীর মনোযোগ দিয়ে একটি প্রেস রিলিজ দেখছেন। কামালকে দেখে বললেন, 'আওয়ামী লীগের প্রেস রিলিজ। ৩ থেকে ৬ মার্চ আধবেলা হরতাল, সারা দেশে। ৭ তারিখ দুপুরে বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা দেবেন রেসকোর্সে।'

কামাল অফিস থেকে যখন বেরুলো তখন দেখলো ত্রস্তপদে অনেকে ফিরছে, অনেকে আবার নিশ্চিন্ত মনে জটলা পাকিয়ে গল্প করছে।

সকালে হরতালে পথে বেরুনো এখন স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে গেছে। ঊনসত্তরের মতো রুটিন হয়ে গেলো ফের, ভাবলো কামাল। সকালে সে গেলো ইকবাল হলে, সেখানে শহীদ ফারুক ইকবালের লাশ নিয়ে আসা হয়েছে। অন্য আরও কয়েকজন নিহতের। ছাত্র-জনতার সঙ্গে অনেক শিক্ষকও এসেছেন শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। ফারুক ইকবালকে কবর দেওয়া হবে মৌচাকের মোড়ে। আবু জর গিফারি কলেজের উল্টোদিকে। অনিল আর ওবায়েদকে পেলো কামাল সেখানে। তারা তিনজন এলো কলাভবনে। কামাল দেখলো তাদের ম্যাক স্যার মানে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরীর নেতৃত্বে শিক্ষকরা প্রতিবাদ মিছিলের জন্য তৈরি হচ্ছেন। সেখান থেকে কামাল আর অনিল এলো শরীফ মিয়ায়।

ছফা ভাই সেখানে বসে চা খাচ্ছেন। কামালকে দেখে বললেন, 'তোমাকেই মনে মনে খুঁজছি। একটু বসো। আরও কয়েকজন আসবে। আমাদের একটা কিছু করতে হবে।' করণীয় হলো লেখকদের একটি প্রতিবাদ সভা করতে হবে। আর শেখ সাহেবের ওপর চাপ রাখার জন্য ৬ তারিখ পত্রিকা বের করতে হবে। একটু পরে এলো মুহম্মদ নূরুল হুদা,

রফিক নওশাদ, সাযযাদ কাদির। সবাই উঠতি কবি। হুদা কামালের এক বছরের সিনিয়র, নওশাদ এক বছরের জুনিয়র, কাদির দু'বছরের সিনিয়র। পত্রিকার ব্যাপারটা আগে ঠিক হলো। পত্রিকার নাম রাখা হলো 'প্রতিরোধ'। সবাই কাজ ভাগ করে নিলো। কীভাবে লেখক সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা যায় সে নিয়েও চিন্তাভাবনা হলো।

দুপুরে বাসায় না ফিরে টিএসসিতে খেয়ে কামাল রওনা হলো পল্টনের দিকে। ছাত্রলীগ সেখানে সভা ডেকেছে। ছাত্রলীগ আকর্ষণ নয়। শেখ সাহেব সেখানে বক্তৃতা দেবেন। তিনি কী বলেন, সেটা শোনার আগ্রহই সবার।

পল্টন কানায় কানায় পূর্ণ। ডাকসু আর ছাত্রলীগের নেতারা আছে। বঙ্গবন্ধু এলেন খানিক পরে। ছাত্রনেতারা জানালেন এখন তাদের পরিষদের নাম 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ।' তারা একটি ঘোষণাপত্র পাঠ করেছেন। ঘোষণাপত্রটি বিলি করা হলো। সংগ্রাম পরিষদ 'স্বাধীন বাংলাদেশ' কথাটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মানুষজন হাততালিতে ফেটে পড়লো। ছাত্র নেতারা আরও ঘোষণা করলেন, এই স্বাধীন দেশের জাতীয় সংগীত হবে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।' বঙ্গবন্ধু হলেন 'স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক।' আবার হাততালি। বঙ্গবন্ধু ৬ তারিখ পর্যন্ত হরতাল চালিয়ে যেতে বলেন, সাত তারিখ তিনি নতুন কর্মসূচি দেবেন। জনতা স্লোগান ধরলো—

'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর'।
'গ্রামে গ্রামে দুর্গ গড়, মুক্তিবাহিনী গঠন কর।'

দুটি স্লোগানই কামালের কাছে নতুন ঠেকলো, জনসভা ছেড়ে বেরুবার সময় দেখা হলো ফয়েজ আহমাদের সঙ্গে। কামালকে দেখেই বললেন, 'চলো আমার অফিসে। এক কাপ চা খাইয়া যাবা।'

ফয়েজ ভাই আজাদ ছেড়ে দিয়েছেন বেশ কিছুদিন হলো। এখন তিনি সাপ্তাহিক 'স্বরাজ' নামে একটি পত্রিকা বের করছেন। কামালকে তার তোপখানার অফিসে নিয়ে চা খাওয়ালেন, বললেন, 'পয়সা হয়ত পাবে না, তবে মাঝে-মাঝে লেখা দিও।'

ছয় তারিখ পর্যন্ত ঘোরের মধ্যে কেটেছে কামালের। এ ক'দিন সে আজাদ, স্বরাজ আর প্রেসে থেকেছে 'প্রতিরোধের' কাজে। প্রতিদিন একই ঘটনা ঘটছে। কারফিউ, কারফিউ ভঙ্গ করে মিছিল, সেনাবাহিনীর গুলি,

হরতাল, কারফিউ, গুলি। গুলির বিরাম নেই, মানুষের মরারও বিরাম নেই। শেখ মুজিব ছাড়া কারও কথা কেউ শুনছে না।

ফয়েজ ভাইয়ের কাগজে হেড লাইন—

'ঢাকা বন্ধ : কারফিউ : বুলেট : হত্যা', সাবহেডিং

'হত্যা শুধু নরহত্যা! রংপুর, চট্টগ্রাম, খুলনা, যশোরে আর ঢাকায় গত ক'দিন ধরে এক বিভীষিকাময় অবস্থা বিরাজ করছে...'

"হরতাল শুধু হরতাল, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, বাজার-হাট সব কিছু বন্ধ হয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের দল রাস্তায় টহল দিতে শুরু করল।... রাতের অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো সংঘর্ষ। শত সহস্র ঢাকাবাসী সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করে প্রকাশ্য রাজপথে বেরিয়ে এল। ঢাকা নগরী রক্তস্নাত হলো... ঢাকায় ২৬ জন নিহত হলো। চট্টগ্রাম দেওয়ানহাট, রেলওয়ে কলোনি, টাইগার পাস মানুষের রক্তে পিচ্ছিল হয়ে উঠলো। নিহতের সংখ্যা ১২০-এ উপনীত হলো,... এরপরেই খুলনা আর রংপুরের বীর সংগ্রামের সংবাদ এসে পৌঁছালো।... ৯ জন নিহত হলো। যশোরে এক বৃদ্ধাকে হত্যা করলো।... ঢাকা, সিলেট, খুলনা, রংপুর, খালিশপুরে শুধু কারফিউ আর কারফিউ।"

ঠাঁটারিবাজারে আলী ইমামের বাসার পাশে ছোট এক প্রেস। সেখানে গোপনে ছাপা হচ্ছে প্রতিরোধ। পুলিশকে বিশ্বাস নেই। দুপুরে আলী ইমামের বাসায় বিশ্রাম নিয়ে প্রেসে গেছে কামাল। সবাই মিলে হেডলাইন তৈরি করেছে। 'আপসের বাণী আগুনে জ্বালিয়ে দাও'—সবার খুব পছন্দ হয়েছে হেডলাইন।

'ইয়াহিয়া খান বাঙালিদের ধমক দিয়েছে আজ,' বললো রফিক, 'এর জবাবে এই হেডলাইন-ই ভালো।'

'বালুচিস্তানের কসাইকে এখন গভর্নর করা হয়েছে।' বললো হুদা, 'নাম টিক্কা খান।'

এর মধ্যে পাকিস্তানিরা অনেক কিছু করছে যা নিয়ে কামাল মাথা ঘামায়নি। পশ্চিম পাকিস্তানেও ভুট্টো বিরোধীরা হরতাল ডাকছে, প্রতিবাদ জানাচ্ছে। গুজব শোনা যাচ্ছে, বেসামরিক পোশাক পরে পশ্চিমা বাহিনী ঢাকা আসছে। ভদ্রলোক অ্যাডমিরাল আহসানকে সরিয়ে সামরিক প্রশাসক সাহেবজাদা ইয়াকুব এবং তারপর টিক্কা খানকে গভর্নর করা হয়েছে। টিক্কা বোধ হয় ঢাকা রওনা হয়ে গেছেন। মানুষ খালি বলছে যেন বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করুক। গুলি করে মানুষ দমানো যাবে না দেখে সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

সন্ধ্যার আগে পত্রিকার প্রথম কপিটি নিয়ে কামাল সাইকেলে চাপলো। সোজা কাদেরের বাসায়। পত্রিকার কপি কাদের উল্টেপাল্টে দেখে বললো, 'ঠিক করেছিস। আমাদের নেতারাও চাপ দিচ্ছেন ৭ তারিখ স্বাধীনতা ঘোষণার।'

'৭ তারিখ জনসভায় এগুলো বিক্রি করবো। খরচের টাকা ওঠাতে হবে। তুই, অনিল, জাহিদ, মিলি, ওদেরকে বলিস টিএসসির সামনে থাকতে।'

রাতে খাওয়ার সময় আব্বা বললেন, 'কালকে আমরাও যাবো ভাবছি রেসকোর্সে। খেয়ে তোর হক চাচাকে বলে আসিস রেডি থাকতে।'

কামাল খেয়েদেয়ে হক চাচাকে খবরটা দিয়ে দোলার ঘরে গেলো। দোলার হাতে 'প্রতিরোধের' কপিটা দিয়ে বললো, 'দেখেছিস কী করেছি।' না, ঠাট্টা নয়, কামাল লক্ষ্য করলো, দোলা সত্যিই অবাক হয়েছে।

'শোন দুটোর মধ্যে রেডি থাকবি। রেসকোর্সে নিয়ে যাবো।'

'সত্যি'।

'হ্যাঁ সত্যি। বাবা-চাচারা যখন যাচ্ছে তখন তোরও যেতে আর বাধা নেই। দেরি করবি না, তাহলে রিকশা পেতে মুশকিল হবে।'

পরদিন দুপুরে খেয়ে দোলাকে নিয়ে কামাল টিএসসি পৌঁছালো। কিছুক্ষণের মধ্যে নওশাদ এক গোছা কাগজ এনে কামালকে পৌঁছে দিলো। তিনটার দিকে কাদের এল বন্ধুদের নিয়ে।

কামাল সবাইকে গোটা ২৫ কপি দিয়ে বললো, 'চার আনা' করে বিক্রি করবি। দোলা এখানে থাকলো বাকি কপি নিয়ে, শেষ হলে এখান থেকে নিয়ে নিবি।'

রেসকোর্সে খালি মানুষের মাথা। ঢাকা শহরে এর আগে এতো মানুষ বোধহয় আর কখনও আসেনি। শুধু ঢাকা কেনো, বাইরে থেকে যারা পেরেছেন তারাও এসেছেন। লোকের হাতে লাঠি, এমনকি মহিলাদের হাতেও। তীরধনুক, বৈঠাও আছে অনেকের হাতে। এ প্রান্ত থেকে স্লোগান 'ভুট্টোর মুখে লাথি মার বাংলাদেশ স্বাধীন কর' 'তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা।' অপর প্রান্ত থেকে 'তোমার দেশ আমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ', 'তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব শেখ মুজিব।' কিছুক্ষণ পর পর 'জয় বাংলা।' হয়ত এক প্রান্ত থেকে কেউ স্লোগান তুললো জয় বাংলা সেটি আস্তে আস্তে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো উথলে উঠতে লাগলো তারপর অপর প্রান্তে এসে আছড়ে পড়লো। কিছু মহিলা ভাটিয়ালি সুরে

গাইছেন—'মরি হায়রে হায়, দুঃখের সীমা নাই, সোনার বাংলা শ্মশান হইল পরান ফাইডা যায়...'।

আনায় মুড়ি-মুড়কির মতো বিক্রি হচ্ছে প্রতিরোধ। আধা ঘণ্টায় সব কপি শেষ। এতো ভিড় যে তারা টিএসসির সামনে রেসকোর্সের জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে রইল। এক সময় দূরে অনেক দূরে মঞ্চে দেখা গেলো হুড়োহুড়ি। চাঞ্চল্য। এরপর সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি, কালো হাফ কোট, হাতে পাইপ নিয়ে বঙ্গবন্ধু মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন। মানুষজন উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লো, চারদিকে হাত তুলে অভিবাদন জানিয়ে মাইকের সামনে দাঁড়ালেন। বিষাদমাখা কণ্ঠে বলেন, "ভায়েরা আমার, আজ দুঃখ-ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বুঝেন..."

পুরো রেসকোর্স নিস্তব্ধ। মনে হচ্ছে একটি পাতা ঝরে পড়লেও শব্দ শোনা যাবে। বঙ্গবন্ধুর স্বর ওঠা-নামা করছে। প্রতিটি শব্দ যেন শ্রোতার মনে গেঁথে যাচ্ছে। মন্ত্রমুগ্ধ সবাই, কেউ চোখ ফেরাতে পারছে না, তিনি বলে যাচ্ছেন "ভাইয়েরা, আমার ওপর বিশ্বাস আছে ? আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, মানুষের অধিকার চাই..." তারপর বললেন, আজ থেকে সব বন্ধ, মাসের শেষে বেতন নিয়ে আসবেন। "যদি একটি গুলি চলে তাহলে বাংলার ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, আমার সহকর্মীরা না থাকে, আপনারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।"

"সাত কোটি মানুষকে আর দাবায়া রাখতে পারবা না। বাঙালি মরতে শিখেছে, তাদের কেউ দাবাতে পারবে না।" গলার স্বর উঠছে নামছে। ফুরিয়ে এলো বলা, সব শেষে "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।" 'জয় বাংলা' জয় বাংলা' গর্জে ওঠে রেসকোর্সের লাখ লাখ মানুষদের কণ্ঠে।

কামাল টিএসসির লনে বসে আছে। জাহিদ বললো, 'অনেকে কিন্তু হতাশ হয়েছে, তিনি স্বাধীনতার কথা বললেন না।'

'সব কিছুই তো বললেন,' বললো কাদের, 'এরপর আর বলার কী থাকতে পারে ?'

'একটা কথা আমাদের বোঝা উচিত।' শান্ত স্বরে বলে মিলি, 'আমরা এখনও পাকিস্তানের মধ্যে আছি। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা তো অস্বীকার করেননি। তিনি চান তাকে নয়, পাকিস্তানকে যেন দোষী করা হয়।'

'আমি খুশি,' বলে কামাল, 'আমি রাজনীতিতে এতো কূটচাল বুঝি না। কিন্তু আমরা সবাই বুঝেছি, সংগ্রাম সামনে বঙ্গবন্ধু আমাদের প্রস্তুত থাকতে বলেছেন। এর বেশি আর কী আশা করিস ? যদি দেখিস, আগামীকাল তার কথা কেউ না শোনে তাহলে বুঝবি মানুষ খুশি হয়নি।'

আরও কিছুক্ষণ আড্ডা দেওয়ার পর কামাল আর দোলা রওয়ানা হলো পল্টনের দিকে। হাঁটতে হাঁটতে দোলা বললো, 'তা হলে কী স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয়ে গেলো ?'

ত

পরে, অনেক পরে, যখন ঠিক ঠিকই যুদ্ধ চলছে, তখন কখনও অবসরে একলা থাকলে কামাল ভাবার চেষ্ট করেছে, ৭ মার্চের পর প্রতিদিন ঠিক কী কী ঘটেছিলো। অনেক চেষ্টা করেও সবকিছু সে মনে করতে পারেনি। আসলে অধিকাংশই পারবেন না। ৭ তারিখ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত মনে হয়েছে দীর্ঘ একদিন মাত্র।

৭ তারিখের পর বামপন্থি অনেকে বলতে লাগলেন, শেখ মুজিব কেন স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। অন্যরা বলতো, স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছে এখন অপেক্ষামাত্র। কামাল এসব তর্ক-বিতর্কে যেতো না। কারণ সবাই দেখছে, পাকিস্তান সরকার এখানে অচল, ৭ তারিখ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত শেখ সাহেবের হুকুমই একমাত্র হুকুম। মিলি একদিন বলেছিলো, 'ইতিহাসে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের কথা শুনেছি। কিন্তু পৃথিবীতে এতো সফল আন্দোলন বোধ হয় আগে হয়নি।'

'আমি মাঝে-মাঝে ভাবি।' কামাল বলেছিলো, 'সেই কোথাকার টুঙ্গিপাড়া থেকে সামান্য পরিবারের এক মানুষ অসামান্য কাজ করলেন, যা গত ৭০০/৮০০ বছরেও কেউ করতে পারেনি। যথার্থ অর্থেই তিনি মহামানব।'

ঢাকার বাইরে বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ হচ্ছে, গুলিও হচ্ছে, মানুষ মারাও যাচ্ছে। কিন্তু মানুষজন দমছে না। পাকিস্তানি সরকারের সঙ্গে কোন সমঝোতা করছে না। এমনকী সরকারি অফিসও চলছে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে। অনিল ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত। তারা প্রশিক্ষণ শুরু করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকাবুকো মেয়েরা জিমনেসিয়ামের মাঠে ডামি রাইফেল নিয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

একদিন কাদের, ওবায়েদ আর কামাল দেখতে গেছে প্রশিক্ষণ। ওবায়েদ ঠাট্টা করে বললো, 'আচ্ছা এসব প্রশিক্ষণ নিয়ে মাতামাতি হচ্ছে, আসল অস্ত্রশস্ত্রের সামনে এরা দাঁড়াতে পারবে ?'

'আসল হচ্ছে স্পিরিট,' কামাল জবাব দিয়েছিলো, 'মানসিকভাবে শেষ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করা।'

এরপর কাদেরের সঙ্গে কামালের দেখা হয়নি। বিভিন্ন এলাকায় জয় বাংলা গ্রুপ গঠিত হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের জন্য। সে এগুলো নিয়ে ব্যস্ত। কামালও ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো পত্র-পত্রিকায় আর সাহিত্যিকদের সমাবেশ নিয়ে। তোপখানা রোডে তারা প্রতিবাদ সমাবেশ করে, মিছিল করে; হাশেম ভাই

সবার এক দাবী। 'স্বাধীনতা'।

ও অন্যান্য শিল্পীরা মিছিলের আয়োজন করলেন, তাতে নেতৃত্ব দিলেন জয়নুল আবেদিন। তাদের ব্যানারে লেখা 'স্বাধীনতা'। আহসান হাবীব, জয়নুল সবাই পাকিস্তানি তমঘা ফেরত দিলেন। প্রতিদিন বিকেলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, গ্রুপের সমাবেশ সবার এক দাবি 'স্বাধীনতা'।

তাহলে কী স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল?

কামাল, শাহরিয়ার ব্যস্ত ছিলো 'রানার' নামে একটি পত্রিকা নিয়ে। বেনজীরের সম্পাদনায় তা বের হবে। সব তরুণরা এর কর্মী।

শাহরিয়ার আর কামাল গিয়েছিলো শিল্পী মুর্তজা বশীরের কাছে। তিনি সুন্দর একটি স্কেচ করে দিয়েছিলেন। চারদিকে উত্তেজনার বুদ্বুদ।

মওলানা ভাসানীকে নিয়ে যারা দোনামনা করেছিলেন, মওলানা সাহেব নিজেই সে সন্দেহ ভেঙে দিলেন। ৯ তারিখ তিনি পল্টনে এক জনসভা ডেকেছিলেন। কামাল গিয়েছিলো। মওলানা সাহেব তার সেই অননুকরণীয় ভঙ্গিতে বললেন, "প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকেও তাই বলি, অনেক হয়েছে আর নয়। তিক্ততা বাড়াইয়া আর লাভ নেই। 'লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীনের' নিয়মে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লও। মুজিবের নির্দেশমতো আগামী ২৫ তারিখের মধ্যে কোনও কিছু না করা হইলে আমি শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে হাত মিলাইয়া ১৯৫২ সালের ন্যায় তুমুল আন্দোলন শুরু করিব। খামোকা কেউ মুজিবকে অবিশ্বাস করিবেন না। মুজিবকে আমি ভালো করিয়া চিনি।"

ভুট্টোর হুমকি-ধমকি সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক এমপি ঢাকা আসা শুরু করলেন। তারা ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎও করছেন। ইয়াহিয়া খানও ঢাকা এসেছেন। শেখ মুজিবের সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠকও করছেন। অনেকে আশাবাদী, বোধহয় ফয়সালা একটা হবে। কামালের আব্বা একদিন রাতে খাবার টেবিলে কামালকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার বোধহয় মীমাংসা একটা হয়ে যাবে।'

'মনে হয় না,' কামাল বললো, রহিম সাহেব একটু নিরাশ হলেন।

একদিন কামাল সকালে বেরুবে। সাইকেলটা সে মুছছিলো, দোলা দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। বললো, 'আচ্ছা কামাল, তুই তো হইহই করে বেড়াচ্ছিস। আমাকে তো একলা বেরুতে দেয় না। তুই আমাকে নিয়ে একদিন ঘুরে বেড়াবি ?'

'কখন কী গন্ডগোল হয় তার ঠিক আছে ?' বলে কামাল, 'তুই বাসায় বসে তো সব খবরাখবরই পাচ্ছিস।'

'তুই মিলিকে, সরি, মিলি আপাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াস না ?' পাল্টা প্রশ্ন দোলার।

'কিসের সঙ্গে কী ? মিলি আমার ক্লাস ফ্রেন্ড, দেখা-সাক্ষাৎ হবে, সে বড়, নিজের দায়িত্ব নিতে পারে।'

'আমি কী বড় হইনি ? তোর চোখ কী চোখ না মার্বেল,' বলে রাগ করে দোলা চলে যায়।

কামাল সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সাইকেল চালাতে চালাতে ভাবে, না, মেয়েটাকে এভাবে বলা ঠিক হয়নি। কালই তাকে নিয়ে বেরুবে। রাতে ফিরে দোলাকে বললো, 'রেডি থাকিস। তোকে নিয়ে বেরুবো।'

চাচিকে বলে সকালে দোলাকে নিয়ে বেরুলো। জিজ্ঞেস করলো, 'কই যাবি।'

'যেখানে খুশি।'

একটা রিকশা নিয়ে বললো কামাল, 'চল সদরঘাট যাই।'

সদরঘাটে রিকশা ছেড়ে দোলাকে বললো, 'চল'।

'কোথায় ?'

'বুড়িগঙ্গা দেখাতে নিয়ে যাই।'

বুড়িগঙ্গার সেই নৌকা আর লঞ্চের ভিড়। দেখে মনে হয় না, ঢাকা শহর টগবগ করে ফুটছে। দোলা বললো, 'নৌকায় ঘুরবি ?'

'চল, তুই যা বলবি তাই সই।'

নৌকা একটা ভাড়া করে কামাল বললো, 'একবার ওপার তারপর এপার।' দোলাকে নিয়ে উঠলো নৌকোয়। পাটাতনে বসে দোলা হাত ধরে আছে কামালের। চোখে খুশি। কামালের ভালো লাগছে। ঢেউয়ের ছলাৎ ছলাৎ, মৃদু বাতাস। কামাল বললো, 'আচ্ছা দোলা সত্যি সত্যি যদি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, কী হবে ?'

'কী হবে তা বলবো কীভাবে ? ভালো যে কিছু হবে না তা তো নিশ্চয়। আমি এতকিছু বুঝি না। তুই ভালো থাকলেই ভালো।'

'ধর আমার যদি কিছু হয়, তোর মনে থাকবে আমার কথা ?'

দোলা কামালের মুখ চেপে ধরলো। বললো, 'এসব অলুক্ষণে কথা বলবি না।'

'আরে না না,' কামাল হেসে বলে, 'আমি মরে গেলে তোকে এ ভাবে ঘোরাবে কে ?'

'মনে থাকে যেন।' বলে দোলা।

বুড়িগঙ্গায় ঘুরে ফের রিকশা নিয়ে রওনা হলো কামাল ইউনিভার্সিটির দিকে। বললো, তুই ভার্সিটি স্টুডেন্ট হওয়ার আগে তোকে টিএসসিতে খাইয়ে দিই। আর ওখানে কিছু না কিছু বন্ধু-বান্ধব পাবো।'

এতো হই হট্টগোলের মধ্যেও টিএসসিতে ভিড়ের কমতি নেই। কামাল খোঁজাখুঁজি করে অনিলকে মাত্র পেলো। মিলির দেখা পেলো না। যদিও ওর খুব ইচ্ছে করছিলো মিলির সঙ্গে দেখা করার।

খেতে খেতে অনিলকে বললো কামাল, 'কাল বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন, আমাকে কভার করতে যেতে হবে। তুই মিলি, কাদের, জাহিদকে পাস কি না দেখিস তো। টিএসসিতে সবাই মিলে খাবো।'

'অনেকে হল ছেড়ে বাড়ি চলে যাচ্ছে। দেখি কাকে কাকে পাই। আচ্ছা, টিক্কা খান কেমন ল্যাংটা খেলো বলতো।' অনিল মন্তব্য করে।

টিক্কা খান গভর্নর হয়ে এসেছেন। প্রধান বিচারপতি বিএ সিদ্দিকীর শপথ পড়াবার কথা। তিনি বললেন, অসুস্থ। শপথ পড়াতে পারবেন না।

খাওয়ার পর খানিকটা আড্ডা দিয়ে দোলাকে নিয়ে গেলো 'রানার' অফিসে, পরিচয় করিয়ে দিলো সবার সঙ্গে। সবাই মহাব্যস্ত। শাহরিয়ার বললো, 'দোলা বসুক। তুমি এক কলাম লিখে দাও তো।'

লেখা শেষ করে বিকেলের দিকে হাঁটতে হাঁটতে দোলাকে নিয়ে ফিরে এলো কামাল পল্টনে। গেট খোলার আগে, কামালের হাত ধরে দোলা বললো, 'আজকের দিনটি আমার অনেক দিন মনে থাকবে।'

পরদিন টিএসসিতে অনিল, মিলি অপেক্ষা করছিলো কামালের জন্য। অনিল বললো, 'কাদেরকে পেলাম না। জাহিদ বাড়ি চলে গেছে। তোর খবর কী বল।'

'৩২ নম্বর গিয়েছিলাম।' জানালো কামাল, 'লোকের ভিড়, জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে এসেছে সবাই। বঙ্গবন্ধু বাইরে এলেন। দৈনিক পাকিস্তানের হেদায়েত হোসেন মোরশেদ জিজ্ঞেস করলেন, 'বঙ্গবন্ধু জন্মদিনে কেমন লাগছে আপনার ?' বঙ্গবন্ধু বললেন, "আমি আমার জন্মদিনের উৎসব পালন করি না। এই দুঃখিনী বাংলায় আমার জন্মদিনই বা কী আর মৃত্যুদিনই বা কী। এ দেশের জনগণের কাছে জন্মের আজ নেই কোনও মহিমা। এখনি কারও ইচ্ছা হলো প্রাণ দিতে হয়। বাংলাদেশের জনগণের জীবনের কোনও নিরাপত্তাই তারা রাখেনি। জনগণ আজ মৃতপ্রায়। আমার আবার জন্মদিন কী ? আমার জীবন মানুষের জন্য। আমি তাদেরই লোক। একজাক্ট কথাগুলো বললাম।"

'আমি মাঝে-মাঝে ভাবি,' বললো মিলি, 'বঙ্গবন্ধু কীভাবে দিন কাটাচ্ছেন ? সাড়ে সাত কোটি লোক তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। এ চাপেই তো মানুষের নার্ভাস ব্রেক ডাউন হয়ে যায়।'

'তাঁর হবে না, এ জন্যই তিনি বঙ্গবন্ধু।' বলে অনিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর অনিল চলে যায়। মিলি আর কামাল খানিকক্ষণ গল্প করে। মিলি বলে, 'কামাল কয়েকদিন পর বাড়ি চলে যাবো। কবে আবার দেখা হবে জানি না।'

'হ্যাঁ। চলে যাওয়াই ভালো। গন্ডগোল শুরু হলে হয়ত হল বন্ধ হয়ে যাবে। তখন মুশকিলে পড়বে।'

'তাই ভাবছি,' বলে মিলি, 'ভালো থেকো।' স্বাধীন দেশে যেন আবার আমাদের দেখা হয়।'

দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কাদেরের খোঁজ করে পাচ্ছিলো না কামাল। ১৯ তারিখ রানারের কাজ শেষ করে পরে বাসায় এসেছে। হুড়মুড় করে কাদের হাজির। রহিম সাহেব দরজা খুলে দিলেন।

'লেগে গেছে চাচাজান,' উত্তেজিত সুরে জানালো কাদের, কামাল বের হয়ে এসেছে ঘর থেকে।

'কী লাগলো ?' জিজ্ঞেস করেন রহিম সাহেব।

'চাচি, এক কাপ চা,' কাদের হুকুম করে। কামালের মা ছেলেটিকে ভালোবাসেন। একটু পাগলাটে, বললেন, 'দিচ্ছি বাবা। স্থির হয়ে বসো।'

'জয়দেবপুরে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করেছে। জনতার ব্যারিকেড ভাঙতে হুকুম দিয়েছিলো পাঞ্জাবি কমান্ডার। বাঙালি সৈনিকরা তা মানেননি।'

'দাঁড়াও দাঁড়াও, ভালো করে শুনি,' বললেন রহিম সাহেব, 'কামাল তোর হক চাচাকে ডেকে আন।' কামাল হক চাচাকে ডাকতে গেলো, হক চাচা একা নন, চাচি-দোলাসহ এলেন।

'মেজর সফিউল্লাহ নামে এক বাঙালি অফিসারকে হুকুম করা হয়েছিলো, তিনি মানেননি। ব্যাপারটা বোঝেন। জয়দেবপুরের রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড।'

কাদের চা খেতে খেতে আরও জানালো, সারা দেশে জয় বাংলা বাহিনী গঠিত হয়েছে। সবাই প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আর এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়লে পাকি সেনাদের কোনও উপায় থাকবে না। গুজব শোনা যাচ্ছে, বাঙালিদের শায়েস্তা করার জন্য দলে দলে সৈন্য আনা হচ্ছে। ভুট্টোও আসছেন ২১ তারিখ। ছাত্ররা তৈরি। এবার শেষ লড়াই হবে। বঙ্গবন্ধু অবশ্য চাচ্ছেন রক্তপাত ছাড়া মীমাংসা করতে। তাই তিনি আলোচনা করছেন প্রেসিডেন্টের

সঙ্গে। কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতা, ছাত্র নেতাদের প্রস্তুত থাকতে বলেছেন।

'চাল-ডাল কিছু কিনে রাখলে কেমন হয় ?' জিজ্ঞেস করেন দোলার মা।

'কী যে বলেন চাচি,' কাদের বললো, 'যুদ্ধ যদি এক বছর চলে ?'

'তা ঠিক তা ঠিক।' কিন্তু দেখা গেলো রহিম সাহেব ও হক সাহেব খুবই চিন্তিত। কাদের আরও কিছু খবরাখবর দিয়ে চলে যায়।

ভুট্টো এসে উঠেছিলো ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে। সে যে ভয় পেয়েছে বোঝা গেছে। নিজের গার্ড নিয়ে এসেছে। শেরাটনের সামনে লোকের ভিড়। মুহুর্মুহু স্লোগান, ভুট্টোর মুখে লাথি মার, বাংলাদেশ স্বাধীন কর, 'জয় বাংলা জয় বাংলা।'

ভুট্টো-ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠক চলছে। প্রেসিডেন্ট যেখানে উঠেছেন সেখানে সাংবাদিকদের ভিড়। প্রতিদিনই আলোচনা শেষে বঙ্গবন্ধু পাইপ হাতে বেরিয়ে আসেন। গম্ভীর হয়ে সাংবাদিকদের বলেন, 'আলোচনা চলছে। আপনারা তো সবই বোঝেন।'

২৩ তারিখ ঢাকা শহরে নয়, সারা প্রদেশেই এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখা গেলো। ঐ দিন ছিল পাকিস্তান দিবস যা এতোদিন সবাই হৈ হৈ করে পালন করেছে। ক্যান্টনমেন্ট ছাড়া সব বাসার ছাদে কালো পতাকা আর বাংলাদেশের পতাকা। পাকিস্তান দিবসকে যেনো কবর দেওয়া হলো। কামাল জয় বাংলা পতাকা একটা কিনে এনেছিলো। দোলা জোগাড় করে দিলো এক টুকরো কালো কাপড়। তাদের ছাদে উড়তে লাগলো দুটি পতাকা।

২৫ তারিখ শাহরিয়ার, কাদের আর কামাল গল্প করছিলো কাদেরের বাসায়। সবার আশা কিছু একটা হবে। দুপুরের পর তারা তিনজন বেরুলো রাস্তায়।

হাঁটতে হাঁটতে ইকবাল হলের সামনে দেখে ছাত্রদের জটলা। তর্কবিতর্ক চলছে। একজন এসে জানালো, ভুট্টো বলছেন, পরিস্থিতি আশংকাজনক। এ খবর শোনা মাত্র অনেকে ৩২ নং ছুটলো।

বিকেলে ৩২ নম্বর পৌঁছে কামালরা দেখলো, মেলা লোকের ভিড় সেখানে। বঙ্গবন্ধু তাজউদ্দীন আহমেদ ও অন্যান্যদের নিয়ে মিটিং করছেন, নেতাকর্মিরা ঢুকছে বেরুচ্ছে। চেনা কাউকে পেলে জিজ্ঞেস করছেন সবাই,

খবরাখবর জানতে চাচ্ছেন। টুকরো টাকরা খবর পেয়ে যা জানা গেলো তা'হলো, ঢাকার বাইরে অনেক জায়গায় সৈন্যরা নামছে। গুলি করছে। মানুষ মারা যাচ্ছে। বাঙালি এক সামরিক অফিসার নাকি খবর দিয়েছেন, ইয়াহিয়া খানকে তিনি দেখেছেন ঢাকা বিমান বন্দর ছেড়ে যাচ্ছেন।

সবার মনে আশঙ্কা অনেকে বাড়ির পথ ধরেছেন। খবর বোধহয় বাতাসের আগে ছুটে যায়। শাহরিয়ার বললো, 'আগামীকাল দেখা হবে। পরে বাস পাবো না।'

কামাল আর কাদের ফার্মগেট পর্যন্ত রিকশা করে আসার সময় দেখলো, লোকজন ব্যারিকেড দিচ্ছে রাস্তায়। রিকশা আর যাবে না। কাওরান বাজারের রাস্তা ধরে তারা পাকিস্তান মটর এলো। সেখানে পেলো রিকশা। রিকশাঅলা বললো, 'চলেন আমিও ঐ দিকে যামু। আপনারাই লাস্ট খেপ।'

থ

কাদেরকে নামিয়ে হেঁটেই বাড়ি ফিরছে কামাল। মুদি দোকানগুলি খোলা, দু'একটি চায়ের দোকানও। দোকানগুলির সামনেও জটলা, ফুটপাতে দু'একজন চাপা স্বরে কথা বলছে। তবে, সবার চোখে মুখে উদ্বেগ, গলিতে দেখলো মহল্লার স্কুল কলেজের ছাত্ররা এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করছে। কামালের চেনা এক কলেজ ছাত্র জানালো, 'কামাল ভাই, খবর পেয়েছি বিভিন্ন জায়গায় মানুষজন ব্যারিকেড দিচ্ছে সাবধানে থাকবেন।'

রাত দশটা নাগাদ খেয়ে দেয়ে কামাল আবার গলিতে নামলো, মানুষজনের আনাগোনা কমলেও লোকজন আছে। গলির কোনে বড় মুদির দোকানের সামনে বেঞ্চিতে বসে কয়েকজন চাপা স্বরে আলাপ করছে। পাড়ারই লোক, কামালকে চেনে। একজন বললো, 'এই মাত্র খবর পাইলাম মিরপুর রোডে, নীলক্ষেতে ছাত্ররা ব্যারিকেড দিচ্ছে সাবধানে যাইবেন।' সবাই সবাইকে সাবধানে থাকতে বলে বিদায় নিচ্ছে। কামাল আরেকটু এগিয়ে সদর রাস্তা অব্দি গেলো। গাড়ি ঘোড়া তেমন নেই কিন্তু সাঁই সাঁই করে দু'টি মিলিটারি জিপ চলে গেলো, কামাল তাড়াতাড়ি গলির দিকে পিছে ফিরলো। তারপর ভালো করে গেট আটকিয়ে দোতলায়। কামালের আব্বা আম্মা তখনও জেগে। রহিম সাহেব উদ্বেগ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিরে কোনো খবর পেলি ?'

'সবাই বলছে সাবধানে থাকতে, খবর ভালো না।'

কামাল নিজের ঘরে চলে গেলো, বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লো, হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছিলো, প্রচন্ড শব্দে জেগে উঠলো, পরপর তিনবার শব্দ, মনে হচ্ছে কামানের যদিও সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই। তারপর একটানা গুলি। চমকে ওঠে জানালার কাছে গেলো। মনে হলো বহুদূর থেকে ভেসে আসছে শ্লোগানের শব্দ 'জয় বাংলা', তারপর গুলি।

কামালের আব্বা আম্মাও জেগে উঠেছেন। খাবার ঘরে আলো জ্বেলে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। এমন সময় কয়েকটা গুলির শব্দ। তাড়াতাড়ি ঘরে এলেন। বাইরে থেকে কে যেনো চিৎকার করে উঠলো, 'বাতি নেভান, বাতি নেভান।'

কামাল ফ্ল্যাটের দরজা খুললো। রহিম সাহেব আতংকের সুরে বললেন, 'কই যাস ?'

'না, কোথাও যাবো না', কামাল একটু নার্ভাস হয়ে বললো, 'এই গেটের কাছে গিয়ে দেখি।'

অন্ধকারে নামলো কামাল। ল্যাম্পপোস্টের আলো জ্বলছে। গেটের ভেতর থেকে দেখলো, যে ক'জন হাটাহাটি করছিলো তারা দৌঁড়ে যাচ্ছে। কামাল জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে ভাই ?'

'মিলিটারি নামছে। জলদি ঘরে ঢুকেন।' আবার গুলির শব্দ। মনে হলো মাথার উপর দিয়ে গেলো। কামাল ভয় পেয়ে মাথা নিচু করে সিঁড়ির দিকে দৌঁড়ালো। বুম বুম বুম একটানা আওয়াজ। হঠাৎ আকাশে তারার মতো জ্বলে উঠলো বাতি, চারদিক আলো হয়ে গেলো। কামাল হাঁপাতে হাঁপাতে ওপরে উঠলো। তখুনিই গুলির শব্দ। মনে হলো ছাদের ওপর দিয়ে চলে গেলো। আম্মা ভয়ে কাঁপছেন। আম্মার মুখ ফ্যাকাশে। বললেন, 'চল নিচে যাই।'

তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরুলো। দরজায় তালা দিয়ে নিচে নামতে লাগলো। কামাল একলাফে কয়েক সিঁড়ি পেরিয়ে ল্যান্ডিংয়ে নেমে দোলাদের দরজার কড়া নাড়লো। হক চাচারা জেগেই আছেন। দরজা একটু খুলে বললেন, 'জলদি।'

গুলির শব্দ বাড়ছে। মাঝে মাঝে দরজা জানালা কেঁপে উঠছে। দোলার রুমটা পেছনের দিকে। হক চাচা বললেন, 'এখানে বসে থাকা ঠিক হবে না। দোলার রুমে চলেন।'

দোলার রুমে মেঝেতে সবাই বসে পড়লেন। বাতি নেভানো। কামাল দরজার পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে। দোলাও কখন তার পাশে

অন্ধকারে বসে তার হাত মুঠো করে ধরে আছে খেয়াল করেনি। কামালের একবার হলের কথা মনে পড়ছে। গুলির শব্দে সচকিত হয়ে উঠছে। ৩২ নংয়ের কী খবর। বুম বুম বুম। তারপর একটানা গুলির শব্দ। হক চাচা ফিস ফিস করে বললেন, 'বোধ হয় স্টেনগানের শব্দ।'

'সবাইকে শেষ করে দেবে,' বললেন রহিম সাহেব।

মনে মনে আশা করছিলো সবাই যে, গুলির শব্দ থেমে যাবে। কিন্তু, না শব্দ কমছে না বাড়ছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। দিনের আলো ফোটার অপেক্ষা করছে। ক্লান্তিতে, ভয়ে মাঝে মাঝে চোখ বুজে এলেও গুলির শব্দে চমকে উঠছে। খুব ভোরে, গুলির শব্দ তেমন নেই, কামালের ঘুম ভাঙ্গলো। ঘুমিয়ে পড়েছিলো, টের পায়নি। জানালা চুঁইয়ে ফিকে আলো, দোলা তার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে। অন্যরা জেগে না ঘুমিয়ে সে বুঝতে পারছিলো না। আস্তে আস্তে অন্ধকার ফিকে হতে লাগলো। দোলা হঠাৎ চোখ খুলে দেখে কামালের কাঁধে মাথা রেখে সে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। লজ্জা পেয়ে সরে বসে।

হক সাহেবের গলা শোনা যায়। 'ট্রানজিস্টরটা কই ?' দোলা উঠে বিছানার এক পাশ থেকে ট্রানজিস্টরটা নিয়ে আসে। ঢাকা রেডিও দেয়াই ছিলো। ঘড় ঘড় আওয়াজ। তারপর উচু, ভাঙ্গা ইংরেজিতে ঘোষণা শোনা গেলো। কারফিউ দেয়া হয়েছে কেউ যেনো ঘরের বের না হয়।

রহিম সাহেব বললেন, 'ওপরে যাই। দরকার হলে আবার নিচে আসবো। কামালের মা,' কামালের আম্মার উদ্দেশে বললেন, 'আজ থেকে খাওয়া রেশান। হিসেব করে খরচ করো। কবে দোকানপাট খুলবে জানি না।'

নিজেদের ঘরে এসে কামাল বারান্দায় দাঁড়ালো। রাস্তাটা দেখা যায়। কারফিউ শোনার পর দেখা যাচ্ছে দৌড়ে লোকজন এদিক সেদিক যাচ্ছে। ঘরের ভেতর চলে এলো।

দুপুরে খাওয়ার পর ট্রানজিস্টরটা নিয়ে খাবার টেবিলে বসলো কামাল। আকাশবাণী ধরার চেষ্টা করলো। রহিম সাহেবও বসলেন। একটু খানিকক্ষণ ঘোরানোর পর পেলো আকাশবাণী। একটি অনুষ্ঠান শেষের পথে। হঠাৎ কাঁপা কাঁপা গলায় ঘোষণা, 'পূর্ব পাকিস্তানে গৃহ যুদ্ধ শুরু হয়েছে।' ঘোষক আরো কী কী বললেন। যুদ্ধ শুরু হয়েছে এই কথাটায় মাথায় থেকে গেলো তারপর গান-'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি,' শুনতে

শুনতে কামালের চোখে পানি চলে এলো। গান শেষ হলে রহিম সাহেব বললেন, 'দেখ আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে।'

বিকেলে রহিম সাহেব নিচে নামলেন। হক সাহেবের সঙ্গে চা খেতে খেতে কথা বলবেন। কতোক্ষণ আর চুপচাপ বসে থাকা যায়। কামালও তার পিছু পিছু নেমে এলো। রহিম সাহেব দোলাদের বাসায় ঢুকতেই সে লনে নেমে এলো। কোনো শব্দ নেই। কোথাও কারফিউ যদিও মাঝে মাঝে দু'একজন কে দেখা যাচ্ছে, দৌড়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছে। সাথে সাথে বারান্দায় দু'একজনকে দেখা যাচেছ। কামাল হঠাৎ লক্ষ্য করলো রাস্তার অন্যদিকের দোতলার বারান্দা থেকে এক ভদ্রলোক তাদের ছাদের দিকে ইশারা করে কী দেখাচ্ছেন। কামাল ছাদে তাকিয়ে দেখে তাদের টাঙ্গানো পতাকা দু'টি বাতাসে পত পত করে উড়ছে। চারপাশে তাকিয়ে দেখালো দু'একটি বাদে সব ছাদে পতাকা শূন্য। সর্বনাশ, সে ছুটলো ছাদের দিকে। পাকিস্তানিদের চোখে পড়লো তো রক্ষা নেই। ছাদে ওঠে ঝটপট পতাকা দু'টি নামিয়ে ফেললো। এক দৌঁড়ে নিচে এসে ঢুকলো দোলাদের ফ্ল্যাটে। তারা তখন সবাই বসে চা খাচ্ছেন। কামাল পতাকা দু'টি দেখিয়ে বললো, 'আরেকটু হলেই তো সর্বনাশ হয়ে গেছিলো।' রহিম সাহেব ও হক সাহেবের মুখ শাদা হয়ে গেছে। দোলা বললো, 'আমাকে দে, লুকিয়ে রাখি।'

'পুড়িয়ে ফেল,' বললেন হক চাচী।

কামালের বুকে ধ্বক করে কথাটা লাগলো। দোলা বললো, 'না, পতাকা পোড়াবো কেন। আমি লুকিয়ে ফেলছি কেউ খুঁজে পাবে না।' কামালের হাত থেকে পতাকাটা নিয়ে সে নিজের ঘরে ঢুকলো।

আজ রাতে সবাই তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলো। কিন্তু রাত বাড়তেই ফের গুলির শব্দ। মাঝে মাঝে ভারি ট্রাকের শব্দ। তবে, গুলির শব্দ শুনে মনে হয় অনেক দূরে কোথাও গুলি চলছে। নিস্তব্ধ রাত ভেদ করে শব্দটা আসছে।

দশটার দিকে, রহিম সাহেব ঘরে ঢুকলে কামাল আস্তে আস্তে সদর দরজা ভেজিয়ে ছাদে উঠে এলো। আমগাছের একটা ডাল ছাদ ছুঁয়েছে। সেখানটায় হাঁটু গেড়ে বসলো। অন্ধকার সয়ে আসছে। ছাদে ওঠায় সে পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে দ্রুত ছুটে যাওয়া জিপের শব্দ। হঠাৎ দূরে কোথায় যেনো আগুন জ্বলে উঠলো। আন্দাজে কামালের মনে হলো পুরনো ঢাকায়। ফের দূরে আওয়াজ বুম বুম বুম। কামাল দেয়াল ধরে বাইরে উঁকি মারলো।

মনে হলো রাস্তায় বুটের শব্দ। সে দ্রুত নিচে নেমে ভেজানো দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লো।

আধো ঘুমে আধো জাগরণে রাত কেটেছে। রেডিওতে এবার পরিস্কার বাংলায় শোনা গেলো আজ অর্থাৎ ২৭ তারিখও কারফিউ। ২৮ তারিখ সকালে দুই ঘণ্টার জন্য কারফিউ থাকবে না। সারাদিন রাত অব্দি বিভিন্ন রেডিও স্টেশন ধরার চেষ্টা করে কামাল। কোন স্টেশনই পুরো খবর দিতে পারছে না। আব্বা-আম্মা, নিচে হক চাচী-চাচা, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নিয়ম করে পড়ছেন।

আটাশ তারিখ সকালে আব্বা ও হক চাচা সহ কামাল বেরুলো। গলিতে এর মধ্যেই মানুষ বেরিয়ে পড়েছে। রহিম সাহেব চেয়েছিলেন দোকান খোলা পেলে কিছু কেনাকাটা করবেন। কোনো দোকান খোলে নি। সদর রাস্তায় পৌঁছে যা দেখলেন তা এতোদিন সিনেমায়ই দেখেছেন। মানুষ বিভিন্ন জায়গায় ছুটছে। একজন দু'জন নয়। দলে দলে। দু'একটি রিকশা দেখা যাচ্ছে যাত্রি ও মালসহ।

দু'একটি গাড়ি ছুটে যাচ্ছে স্পিড তুলে। পথচারিদের কাছ থেকে টুকরো টুকরা খবরে যা বুঝলো তা'হলো, বাকি সৈন্যরা ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। কতো মানুষ মারা গেছে কেউ জানে না। অনেকে গ্রামের বাড়ি, নদীর ওপার চলে যাচ্ছে, আত্মীয়স্বজনের কাছে ছুটে যাচ্ছে। কামালের দিশেহারা লাগছে। ভাবলো একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে যায়। কামালের বাবা একদম রাজি না। আব্বার আদেশ অমান্য করার সাহসও পেলো না। রাস্তায় রাস্তায় মোড়ে মোড়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী হিংস্র মুখে টহল দিচ্ছে। কারফিউর সময় ফুরিয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি তারা ফিরে এলো।

আবার রাস্তাঘাট নির্জন। এমন সময় তাদের সদর দরজায় আওয়াজ। দোতলা থেকে কামাল দেখলো, একটি রিক্সা দাঁড়িয়ে, একজন মহিলা কোলে তিন চারবছরের একটি ছেলে, দোলার বয়সী একটি মেয়ে, সুটকেস ব্যাগ নিয়ে নামছেন। কামাল নিচে নামলো, দেখলো এর আগে হক চাচাই দরজা খুলে দিয়েছেন। কামাল শুনলো, রিকশাঅলা বলছেন, 'তাড়াতাড়ি করেন, নইলে গুলি খামু।' পয়সা মিটিয়ে দিলেন মহিলা। হক সাহেব মহিলাকে দেখে বললেন, 'মর্জিনা, তুই ?' মহিলা কেঁদে হক সাহেবকে জড়িয়ে ধরলেন, 'ভাইজান, আমার কী হবে ?' কামাল সুটকেস আর ব্যাগটা তুলে নিলো।

মর্জিনা হক সাহেবের মামাতো বোন। রাজারবাগ থাকে। স্বামী চাকরি করেন পুলিশে। ২৫ তারিখে ডিউটিতে গিয়েছিলেন আর ফেরেননি। রাজারবাগ পুলিশ লাইন সৈন্যরা ধ্বংস করে দিয়েছে। কতো পুলিশ মারা গেছে জানা যায়নি। বাসায় বড় মেয়ে, দিশা না পেয়ে এখানে ছুটে এসেছেন। তার কাহিনী শেষ করে আবার মর্জিনা কাঁদতে থাকেন। হক সাহেব বলেন, 'শান্ত হ। যে কদিন দরকার থাক। তারপর যখন ইচ্ছে যাবি। ঘর ভালো করে তালা মেরে এসেছিস তো।'

বিষন্ন মনে কামাল ওপরে উঠতে উঠতে ভাবে, সারা দেশেই কী এই অবস্থা ?

রাতে কারফিউর মেয়াদ থাকেই। দিনে কারফিউ শিথিল করা হচ্ছে। সরকারি কর্মচারিদের ৩০ তারিখে কাজে যোগ দিতে বলা হয়েছে। রহিম সাহেবরা অফিস করবেন কিনা চিন্তা ভাবনা করছেন। না গেলে আবার কে কী করে সেটি নিয়েও ঝামেলা, তা'ছাড়া বেতন না পেলে চলবে কী ভাবে ?

মাসের শেষ তারিখে কামালের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। রহিম সাহেব বেরিয়ে গেছেন। কামাল দরজা খুলে দেখে শাহরিয়ার। দু'জনে জড়িয়ে ধরলো দু'জনকে, মহাখালি থেকে বেরিয়েছে শাহরিয়ার বন্ধু-বান্ধবদের খোঁজ নিতে। কামালকে বললো, 'চলো বন্ধু-বন্ধুদের খোঁজ নিয়ে আসি।'

ছোটখাটো দু'একটা দোকান খুলছে। রাস্তায় রিকশাও বেরিয়েছে। একটা রিকশা নিয়ে রওয়ানা হলো তারা পুরনো ঢাকার দিক। সেদিনের রাতের কাহিনী শোনালো শাহরিয়ার। কী ভাবে ট্যাংক আর্মাডকার নিয়ে যুদ্ধ সাজে বেরিয়েছিলো পাকিস্তানি বাহিনী গণহত্যা চালাবার জন্য। ঠাটারী বাজারে আলী ইমামের বাসায় এসে দেখে তালা ঝুলছে। এদিক সেদিক তার বইপত্র ছিটিয়ে আছে। গলিটা নির্জন। গুন্ডা চেহারার কয়েকজন বিহারি ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাড়াতাড়ি রিকশা নিয়ে তারা এগুলো শাখারি বাজার, তাঁতি বাজার প্রায় লোকশূন্য, অনেক বাড়িতে গুলির গর্ত, পোড়া। নয়াবাজার ছাই। কারো বাসায়ই কাউকে পাওয়া গেলো না। কামাল বললো, 'চলো ফিরে যাই। ফেরার পথে কাদেরের বাসায় নামবো।'

কাদেরের বাসার গেটে রিকশা ছেড়ে দিলো, কয়েকবার কলিং বেল টেপার পর কাদেরের খালা দরজা ফাঁক করে উঁকি দিলেন। কামালকে দেখে দরজা খুলে দিলেন। ভেতর দিয়ে কাদেরের ঘরে ঢুকলো।

কাদেরের ঘরে কাদের আর অনিল পাংশু মুখে বসে আছে। জড়িয়ে ধরলো ওরা পরস্পরকে। অনিলকে দেখে খুব অবাক হলো কামাল। অনিল

জানালো, ২৫ তারিখে সে জগন্নাথ হলেই ছিলো। গোলাগুলি শুরু হওয়ার পর ড্রেনে ঢুকে পড়েছিলো সে। জগন্নাথ হলের মাঠে কী ভাবে সবাইকে লাইন ধরে গুলি করে মাটি চাপা দিয়েছে, দেখেছে সে। দু'দিন ড্রেনের মধ্যে পড়ে ছিলো, তারপর কারফিউর মধ্যেই লুকিয়ে চুরিয়ে সাতাশ তারিখ বিকেলে কাদেরের এখানে আশ্রয় নিয়েছে। ঘর ছেড়ে তারা আর বেরোয় নি। 'বঙ্গবন্ধুর কোনো খবর জানো।'

'না,' বললো শাহরিয়ার তবে, 'শুনেছি তিনিও চলে গেছেন। আবার কেউ বলছেন গ্রেফতার হয়েছেন। তবে, আওয়ামী লীগের অনেক নেতাই পালিয়ে যেতে পেরেছেন। সারা দেশেই এখন যুদ্ধ চলছে। অনেকে সীমান্ত পাড়ি দিচ্ছে।'

অনিল এতো ভয় পেয়েছে যে কথা বলতে পারছে না। বাড়ি যাবার কথাও চিন্তা করছে না। কামাল বললো, 'ভয় পাস নে। তোর বাড়ি যাওয়ার বন্দোবস্ত করবো। আমরা যোগাযোগ রাখবো, তবে অনিল তুই বের হোস না।' কামাল যে কথাটা বললো না, তা'হলো হিন্দু দেখলেই সরাসরি গুলি করা হচ্ছে। রাস্তাঘাটে কাপড় খুলে দেখা হচ্ছে মুসলমানি হয়েছে কি হয়নি। কলেমা পড়তে পারে কি পারে না।

বিকেলে রহিম সাহেব ও হক সাহেব এসেও জানালেন, অফিসে অনেকেই আসে নি। তবে বিহারি আর জামায়াত ও মুসলিম লিগের সাপোর্টাররা আসছে। টিটকারি দিচ্ছে বঙ্গবন্ধু আর আওয়ামী লীগকে। হক চাচা বললেন, 'জানিনা কী হবে ? তবে, অফিস না গেলে যে তারা আমাদের আওয়ামী লীগের সাপোর্টার হিসেবে ধরে নেবে তা নিশ্চিত।'

কাদের আর কামাল একদিন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ঘুরে এসেছে। খাঁ খাঁ করছে চারদিক। বট গাছটা কেটে ফেলা হয়েছে। শহীদ মিনার গুড়িয়ে দিয়ে দেয়ালে লেখা হয়েছে মসজিদ। ইকবাল হল জগন্নাথ হল রোকেয়া হলেও আর্মি ঢুকেছিলো। যেখানে ঢুকেছে সেখানেই লাশ রেখে গেছে। চারদিকে খালি লাশ আর লাশ। ওবায়েদের খোঁজ নেই। দু'একজন চেনাশোনার সঙ্গে যে রাস্তাঘাটে দেখা হয় না তা নয়, বিভিন্ন ভাবে খবর যোগাড় করছে তারা। এরই সাথে শুনলো নদীর ওপারে যারা গিয়েছিলো সেনাবাহিনী সেখানে গিয়েও অনেককে হত্যা করেছে। একা নদীর ওপারে অনিলের যাওয়াটা বাতিল করে দিলো কামাল আর কাদের।

এপ্রিলের মাঝামাঝি, পরিস্থিতি নেতিয়ে এসেছে। দোকান পাট খুলছে, অফিস আদালতও খুলছে। মানুষজন চলাফেরা করছে। তবে, রাস্তার মোড়ে

মোড়ে পাকিস্তানি সৈন্য চেক পোস্ট বসিয়েছে। সারাদিন সাজোঁয়া গাড়িতে টহল চলছে। সন্ধ্যার পর রাস্তাঘাট নিঝুম হয়ে আসে। লোকজন এখনও পালাচ্ছে। বিভিন্ন বেতার কেন্দ্র থেকে জানা গেছে, স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়েছে। দলে দলে যুবকরা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে মুক্তিফৌজে নাম লেখাচ্ছে। একজন মেজর জিয়ার কথা শোনা গেলো। কালুর ঘাটে নাকি এক বেতার থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা যুদ্ধের আবেদন জানিয়েছেন।

কামাল অস্থির হয়ে পড়ছে। আব্বা আর হক চাচা একসঙ্গে অফিস যান, ফিরে আসেন। একবার কথা হয়েছিলো ঢাকা ছেড়ে যাবেন। সাহস করেন নি। হক চাচার বোন মর্জিনা রাজারবাগের বাসায় ফিরে গেছে। তার স্বামীর খোঁজ পাওয়া যায়নি। হক চাচা পরিচিত কাউকে খুঁজছেন মর্জিনাকে দেশে পাঠানোর জন্য।

একদিন শাহরিয়ার এসে জানালো, সে ঢাকা ছেড়ে যাচ্ছে। কামাল বিকেলে কাদেরের বাসায় গেলো। অনিল খানিকটা সুস্থ হয়েছে। শাহরিয়ারের খবর জানালো কামাল। কাদের বললো, 'আমাদেরও চলে যেতে হবে, মুক্তিফৌজে নাম লেখাতে হবে। এখানে থাকা যাবে না। রাস্তায় অল্পবয়সী কাউকে দেখলেই সৈন্যরা তুলে নিচ্ছে।' অনেকক্ষণ আলাপের পর তারা সিদ্ধান্ত নিলো, কাউকে না বলে তারা চলে যাবে। নিজেদের কাছে জমানো যা টাকা আছে তা নিয়েই যাবে। কারো কাছে টাকা চাইলে যাওয়া যাবে না। কাদেরের খালা তাকে যেতে দেবেন না। কাদেরের কিছু হলে বোনকে কী বলবেন ? কামালের আব্বাতো কামালকে চোখের আড়াল করতে নারাজ। দিনক্ষণ ও পরিকল্পনাও তারা ঠিক করে ফেললো।

দ

ঢাকা ছাড়ার আগের দিন, বিকেলে কামাল বললো দোলাকে, 'এই ছাদে যাবি ?'

আনন্দে চকচক করে উঠলো দোলার চোখ। বললো, 'অবশ্য।'

সূর্য হেলে পড়ছে, ছাদ থেকে দেখা যায় গলি নির্জন হতে শুরু করেছে। সদর রাস্তায় গাড়ি চলাচলের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ছাদে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালো ওরা একসঙ্গে, সৈয়দপুরের গল্প করলো। কবে যুদ্ধ শেষ হবে, দোলা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবে তা নিয়েও টুকটাক্ আলাপ করলো।

একসময় আমগাছের সেই ডালটার পাশে দাঁড়িয়ে কামাল বললো, 'দোলা তোকে একটা কথা বলতে চাই, যা কেউ জানে না, তোকে প্রমিস করতে হবে কাউকে বলবি না।'

'এই যে তোমার হাত ছুঁয়ে বলছি,' বলে দোলা কামালের হাত ধরে।

'আমি কাল সকালে চলে যাবো ?'

'কোথায় ?'

'যুদ্ধে।'

'মানে ?'

'মানে আমি মুক্তিফৌজে যোগ দেবো। এখানে থাকলে যে কোনোদিন আর্মি ধরে নিয়ে মেরে ফেলতে পারে। বিনা কারণে মরার চেয়ে যুদ্ধে যাওয়া ভালো।'

'অনেকেইতো গেছে শুনছি,' দোলা বললো, কথাটা শুনে সে এতোটা অবাক হয়েছে যে গুছিয়ে কথা বলতে পারছে না। 'তুই না গেলে কী হয়।'

'অনেকে যাচ্ছে দেখেইতো যাবো। আর আমরা জয় বাংলায় বিশ্বাস করি, আমরা না গেলে কারা যাবে ?'

'চাচা-চাচী জানে ?' দোলা প্রশ্ন করে।

'না কেউ জানে না। শুধু তোকে বলছি। ভোররাতে রওয়ানা হবো।' দোলা শুধু কামালের হাত ধরে রইলো। সন্ধ্যা নামছে। তাদের না দেখলে খোঁজাখুজি শুরু হবে। নিচে নামতে লাগলো তারা। দোলা বললো, 'তুই না থাকলে আমার দিন কাটবে কী ভাবে ?'

কামাল নিচে নেমে হক চাচা-চাচীর সঙ্গে চা খেলো। দোলার সঙ্গে ঠাট্টা করলো। দোলা চুপ, অন্যমনস্ক। রাতে আব্বা-আম্মার সঙ্গে খেয়ে স্বাভাবিক ভাবে শুতে গেলো।

ফজরের আজানের সময়ই উঠে পড়লো কামাল। আধো ঘুমে আধো জাগরণে কেটেছে রাত। চিঠি লিখলো এক টুকরো কাগজে—'আব্বা, আপনি-আম্মা আমার সালাম নেবেন। মুক্তিযুদ্ধে যাচ্ছি। দেশ স্বাধীন করে যেনো ফিরতে পারি সে দোয়া করবেন। জয় বাংলা, কামাল।' চিঠিটা খাবার টেবিলে গ্লাস চাপা দিয়ে রেখেছে। কাঁধে একটা কাপড়ের ব্যাগ। দু'টি জামা, প্যান্ট আর লুঙ্গি। আলগোছে দরজা খুলে নিচে নামলো। পরনে পাজামা-পাঞ্জাবী। পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একটা টুপি বের করে মাথায় দিলো।

নিচে নামতেই দেখে দোলা গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কামালকে গেটের দিকে যেতে ইশারা করে দরজা খুলে বের হলো। ভোরের আলো ফুটছে। পাড়ার মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য দু'একজন যাচ্ছে। দোলা এগিয়ে এসে কামালের হাতে দুটো একশো টাকার নোট গুজে দিল।

'যাইরে দোলা।' বললো কামাল। দোলার দু'চোখে পানি। 'আরে যাওয়ার সময় কাঁদিস কেন। দেশ স্বাধীন করে ফিরে আসবো। তুই না থাকলে ঝগড়া করবো কার সঙ্গে ?'

গলির মোড়ে অনিল ও কাদেরকে দেখা গেলো। একই পোশাক, মাথায় টুপি, কামাল বললো, 'ওরা আসছে, যাই, সাইকেলটার যত্ন নিস।'

'তুমি কিন্তু ফিরে আসবে বলেছো, 'দোলা হাসার চেষ্টা করলো, 'দেশ স্বাধীন করে ফিরে এসো তোমরা। আমরা অপেক্ষা করবো তোমাদের জন্য।'

দোলার তুই থেকে তুমিতে যাওয়ায় কামাল হকচকিয়ে গেলো। কিছু বলার আগেই দেখলো, দোলা ফিরে যাচ্ছে আর কাদের ও অনিল এসে দাঁড়িয়েছে।

তারা তিনজনই বায়তুল মোকাররমের দিকে এগোতে লাগলো। আস্তে আস্তে যাতে নামাজ শেষে মুসুল্লিদের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। স্টেডিয়ামের গেটের কাছে পৌঁছতেই দেখলো মুসুল্লিরা নামাজ শেষে বেরিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই মুসুল্লির সংখ্যা কম। ওরা গুলিস্তানের মোড়ে এসে রিকশা পেলো। সকালের রিকশা। বউনির সময় সবখানে যেতে রাজি। কামাল বললো, 'সদরঘাট।' তিনজনে উঠে বসলো রিকশায় চাপাচাপি করে।

সদরঘাট পৌঁছে টিকেট কাটলো। লঞ্চ ছাড়তে ঘণ্টা খানেক। রাস্তার একপাশে রেস্টুরেন্টে বসে গরম চা আর পরোটা খেলো। ভাবটা যেনো, নামাজ পড়ে হেটে ফেরার সময় চা খাচ্ছে। লঞ্চের ভেঁপু বাজার আগে লঞ্চের ডেকে উঠে গেলো। ভিড় কম না। টুপি মাথায় লোকের সংখ্যাও কম না।

দুপুরের আগে চাঁদপুর পৌঁছে জাহাজঘাটায় খানিকটা হাঁটাহাটি করলো। এদিক সেদিক সৈন্যতো বটেই পুলিশও দেখা যাচ্ছে কয়েকজন। রেস্টুরেন্টে বসে দুপুরের খাবার খেতে খেতে জেনে নিলো হাজিগঞ্জ বাস যায় কিনা। হোটেলের বেয়ারা জানালো যায়, তবে মাঝে মাঝে বিনা নোটিশে বন্ধ হয়ে যায়। বেয়ারা বাসস্টপটা দেখিয়ে দিলো। তারা রেস্টুরেন্ট থেকে নড়লো না। যখন দূর থেকে দেখলো বাস আসছে তখন

পয়সা মিটিয়ে উঠে এলো। আলাদা আলাদা ভাবে রাস্তা পেরিয়ে বাসে উঠলো। লককর বাস। যাত্রী মোটামুটি ভরা কেউ কোনো কথা বলছে না। মাঝখানে চেকপোস্টে একবার বাস থামলো, এক মেছুয়া বাসে উঠে সবার দিকে কটমট করে তাকিয়ে নেমে গেলো। আতংকে সবাই বিবর্ণ। বাস চলা শুরু হলে মনে হলো সবাই প্রাণ ফিরে পেলো।

হাজিগঞ্জ যখন নামলো তখন পড়ন্ত বিকেল। রোহিতপুরের দিকে হাঁটছে ওরা। মনে হতে পারে কোনো মাদ্রাসা থেকে তিন তালেব এলেম গ্রামে ফিরছে। সূর্যের আলো মুছে গেছে। ঝিঁঝিঁর শব্দ। অন্ধকার চোখ সয়ে গেছে। ভয় পাচ্ছিলো কারো সঙ্গে না দেখা হয়ে যায়। না, রাস্তা নির্জন। রাত প্রায় ৯ টার কাছাকাছি দাদাবাড়ি পৌছালো কামাল। কাদেরও অনিলকে কাছারির সামনে রেখে সে ভেতরে ঢুকে দাদার ঘরের দরজায় টোকা দিলো।

'কে ?' জলদ গম্ভীর স্বর দাদার। কিন্তু একটু যেনো কেঁপে গেলো।

'আমি কামাল।'

ঝট করে দরজা খুললেন দাদা হ্যারিকেনটা উঁচিয়ে ধরলেন। প্রথমে টুপি পড়া এক তরুণকে দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। পরে জড়িয়ে ধরলেন। তার সঙ্গে ওর আরো দুই বন্ধু এসেছে শুনে বললেন, 'ওদের ভেতরে নিয়ে আয়। কাচারি ঘরে থাকার দরকার নেই। পশ্চিমের ঘর খুলে দিচ্ছি।'

হাত মুখ ধুয়ে লণ্ঠন ঘিরে ওরা তিনজন ও তার দাদা বসে আছেন। দাদী কোনো কথা শোনেন নি। ভাত চড়িয়েছেন। ডাল আছে ডিম ভাজি করে দেবেন। দাদা জিজ্ঞেস করলেন, 'রহিম কেমন আছে, তোর মা ?' সবার কুশল শুনে বললেন, 'তুই কেন বেরিয়েছিস। তোর বাবা মা জানে ?'

'না।' দাদা কোনো জবাব দিলেন না। কামাল চাচার কথা বললো, অনিল কী দেখেছে ২৫ মার্চ তাও বললো। শুনে বললেন, 'আমরাও কম বেশি খবর পেয়েছি। প্রতিদিনই তো শহর থেকে কেউ না কেউ আসছে। এখানে এখনও আর্মি আসেনি। তবে, মুসলিম লীগের লোকদের মাতব্বরি বেড়েছে। আরো জানালেন, দু'একজন করে অল্প বয়েসীরা গ্রাম ছাড়ছে। এ সুযোগে কামাল বললো, 'আমাদের বর্ডার পার করে দেওয়ার চিন্তা করেন। আমরা যুদ্ধে যাবো।'

দাদা কিছু বললেন না। শুধু বললেন, 'পাকিস্তানিরা এরকম করতে পারলো ? এরা মানুষ না জানোয়ার ?'

তিনজন একসঙ্গে বললো, 'ওরা জানোয়ার।'

ঘুমোতে যাওয়ার আগে দাদা বললেন, 'তোমরা স্বাভাবিকভাবেই থাকো। বাইরে খুব একটা বেরিও না। শহর থেকে অনেকেই আসছে, সুতরাং, কেউ সন্দেহ করবে না। আমি দেখি কী করতে পারি।'

দু'দিন পর দাদা বললেন, 'তোমাদের ব্যবস্থা করেছি। আমার এক বন্ধু আছে কুমিল্লায়। তাকে চিঠি দিচ্ছি। তার বাসায় যাবে। সে বর্ডার পার করার বন্দোবস্ত করবে। বাকী সব আল্লাহর ইচ্ছে।'

পরদিন ভোরে দাদা তাদের নিয়ে বেরুলেন। তিনজনের সেই একই পোশাক পরা। গ্রামের শেষ সীমায় পৌঁছে বললেন 'সোজা হাজিগঞ্জ গিয়ে বাসে চলে যাবে কুমিল্লা। আমার বন্ধু থাকে আমলাপাড়ায়। ভয় পেয়ো না।' তিনজনের প্রত্যেকের হাতে একশো টাকার একটি করে নোট গুঁজে দিলেন। তিনজনকেই বুকে জড়িয়ে ধরে দোয়া করে ফু দিলেন। তারপর বললেন, 'ফি আমানিল্লাহ'। অথচ গতবার অনিল হিন্দু বলে একটু বিরূপ হয়েছিলেন।

দুপুরের আগেই হাজিগঞ্জ থেকে বাসে করে তারা পৌঁছে গেলো কুমিল্লা। আর্মি চেক করেনি। রিকশা নিয়ে পৌঁছালো আমলাপাড়া, দাদার বন্ধুকে বাসায়ই পেলো। পরিচয় পেয়ে ভেতরে নিয়ে গেলেন। চিঠিটা পড়লেন। হাসিখুশি মানুষ। বললেন, 'মৌলভী কামাল ভয় পেয়োনা। আমাদের ছেলে মেয়েরা প্রতিদিন বর্ডার পেরুচ্ছে। আমার সঙ্গে যোগাযোগ আছে। চিন্তা করো না। তোমাদের ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি। খালি একটি কথা, বাইরে বেরিও না। এখন খাওয়া দাওয়া করে বিশ্রাম কর।'

এর দু'দিন পরই আগরতলা পৌঁছলো ওরা তিনজন।

ধ

মাসটা ডিসেম্বর। ভারত যুদ্ধ ঘোষণা করেছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। পূর্বাঞ্চলে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনী ঢুকে পড়েছে বাংলাদেশে। চারদিক থেকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে তারা ঢাকার দিকে।

নভেম্বরের শেষের দিকে একটি অপারেশন করার সময় পায়ে গুলি খায় কামাল। অপারেশন শেষে আগরতলায় নিয়ে আসা হয়। গুলিটা বের করা হয়েছে। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠেছে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে। ক্যাম্পে আছে বিশ্রামে। আরো বেশ ক'জন এমন বিশ্রামে আছে। কামালের আফশোস জয়যাত্রায় সে পিছু পড়ে রইলো।

গত নয়মাসের কথা কামাল মনে করতে চায় না। যথানিয়মে তাদের প্রশিক্ষণ হয়েছে তারপর তারা তিনজন ছিটকে পড়েছে, কেউ কারো খবর জানে না। বাবা মা কারো খবর সে জানে না, তবে সারা বাংলাদেশে কী তান্ডব হয়েছে তার খবর পেয়েছে। গত নয়মাস যুদ্ধ ছাড়া কিছু ভাবেনি। 'জয় বাংলা' বলে সে আর তার সাথীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কখনও জয়ী হয়েছে, কখনও পিছু হটেছে। নতুন বন্ধুদের অনেকে ফিরে আসেনি তবে, কামাল বেঁচে আছে।

গত নয়মাসে এ কটা দিন অবসর। প্রতিদিন রেডিওতে খবর শোনে যৌথ বাহিনী এগিয়ে যাচ্ছে। স্বাধীন বাংলা বেতারের গান শোনে। আর এখন তার মনে পড়ছে আব্বা আম্মা, আত্মীয় স্বজনের কথা, হক চাচা-চাচী দোলার কথা, মিলির কথা, দাদা-দাদীর কথা। মাঝে মাঝে বেশি করে মনে পড়ে কাদের, অনিলের কথা। সেতো তবু সবাইকে দেখে শুনে তারপর যুদ্ধে এসেছে। তারাতো ২৫ মার্চের পর বাবা-মা কাকেও দেখেনি। খবরও জানাতে পারেনি, বিশেষ করে অনিল। বেঁচে আছে তো তারা ? দোলার খুনসুটির কথা বেশি মনে পড়ে। অস্থির লাগে। কবে দেশ স্বাধীন হবে, সে ফিরবে।

১৬ ডিসেম্বর বিকেলে রেডিওতে শুনলো হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে। চারদিকে খালি 'জয় বাংলা জয় বাংলা' ধ্বনি। সত্তরের দিনগুলির কথা মনে পড়ে। পরদিন তারা ক'জন কারো অনুমতির তোয়াক্কা না করে বেরিয়ে পড়ে সীমান্তের উদ্দেশে। তারা কেনো, শরণার্থীরাও কারো তোয়াক্কা না করে সীমান্তের দিকে রওয়ানা দিয়েছে।

কামালদের গ্রুপটি কুমিল্লায় পৌঁছার পর যে যার বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়। কামালের মনে হয় ঢাকায় যখন ফিরছে এতোদিন পর, একদিন না হোক দেরি হোক। দাদা-দাদীর সঙ্গে দেখা করেই যাবে।

কুমিল্লা থেকে ভরদুপুরে হাজিগঞ্জে বাস থেকে নামে কামাল। কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, ইউনিয়ন কাউন্সিলের রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছে এক যুবক, কাঁধ ছাপানো চুল দাড়ি গোফে মুখটি ঢাকা, পরণের পোশাক জীর্ণ, এক কাঁধে স্টেনগান, আরেক কাঁধে একটা ঝোলা। অন্যমনস্ক ভাবে একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে যুবকটি।

এই ভরদুপুরে রাস্তায় তেমন লোকজন নেই। দু'একজনের দেখা পায়, তখুনিই তারা চিনে ফেলে একজন মুক্তিযোদ্ধা যাচ্ছে।

'কে ও ?' সেই পুরনো প্রশ্ন।

একই উত্তর।

অন্যমনস্ক কামালের মনে হচ্ছে, দাদা-দাদী বেঁচে আছেন তো ? রাজাকার আলবদরদের উৎপাতের কথা সে শুনেছে। গ্রামকে গ্রাম তারা হানাদারদের এনে জ্বালিয়ে দিয়েছে। কুমিল্লায় আসার পথেই সে শুনেছে তার অনেক প্রিয় শিক্ষককে আলবদররা খুন করেছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু কেন যেন ক্রোধে বুকটা জ্বলে যায়। যুদ্ধ মানুষকে কতোটা বদলে দেয়, কামাল ভাবে। কতোসময় তার সামনেই কাতরাতে কাতরাতে সহযোদ্ধা মারা গেছে, কিন্তু থামেনি, চোখের পানিও ফেলেনি। খালি এক চিন্তা দেশ স্বাধীন করতে হবে।

রোহিতপুরের সীমানায় এসে মুখচেনা দু'এক জনের সঙ্গে দেখা হয়। তারা মুক্তিযোদ্ধা ভেবেই তাকে জড়িয়ে ধরে। বেশ কিছু অল্পবয়েসী তার পিছু পিছু হেঁটে আসতে থাকে আর মাঝে মাঝে চিৎকার করে ওঠে জয় বাংলা। আশেপাশের ক্ষেত থেকে দু'একজন মুখ তুলে তাকায়।

না, গ্রামটার কোনো ক্ষতি হয়নি। কামাল ভাবে। হয়তো অনেক ভেতরে দেখেই। পরাধীন দেশ থেকে সে গিয়েছিলো আজ স্বাধীন দেশেই ফিরছে। এই মাটির জন্যই কি সবার বুকে এতো মমতা মাখা ছিলো ? আগে বলা হোত সে মুসলমান তারপর পাকিস্তানি। এখন সে বাঙালি, স্রেফ বাঙালি। এতোদিনে কি শেকড় খুঁজে পেলো সে।

পড়ন্ত বিকেলে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। দেখে দাদা বসে আছেন সেই মাচায়, ঝিম ধরে। দাদার সামনে গিয়ে সে দাঁড়ায়।

দাদা চমকে ওঠেন। ভাবেন গত ন'মাস তো তিনি কিছুই করেননি। পাকিস্তানকে তিনি ভালোবাসতেন। তাই থানা শান্তি কমিটিতে তাকে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো। বয়সের দোহাই দিয়ে যাননি। তিনি পাকিস্তান চেয়েছিলেন, কিন্তু খুনিদের পাকিস্তানতো নয়, যারা ইসলাম ইসলাম করে মুসলমান হত্যা করে। তিনি তাদের সঙ্গে হাত মেলাতে পারেন না। কিন্তু এ মুক্তিযোদ্ধা কেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ?

'দাদা,' কামাল নরম স্বরে বলে। সংবিত ফিরে পান তিনি, 'কামাল, কামাল,' আনন্দে চিৎকার করে মাচান থেকে নেমে তাকে জড়িয়ে ধরেন, 'আমার নাতি ফিরেছে দেশ স্বাধীন করে।' তার চিৎকার শুনে আশপাশ থেকে মানুষজন ছুটে আসে। বৃদ্ধ সবাইকে বলেন, 'আমার নাতি, মুক্তিযোদ্ধা'। খবর রটে যায়, হাজিবাড়ির মুক্তিযোদ্ধা নাতি এসেছে।

আশেপাশের বাড়ি থেকে মানুষজন বেরিয়ে আসে। দাদা বলেন, 'বসো তোমরা, আমরা আসি।'

কামালকে নিয়ে তিনি ঘরের দিকে রওয়ানা হন। বলেন, 'চিন্তা করিস না। তোর বাবা-মা ভালো আছেন। গত মাসেই খবর পাইছি। আর তোর খবরতো তখনই তাদের জানাইছি।'

ঘণ্টাখানেক পর কামালকে নিয়ে তিনি আবার বেরিয়ে এলেন। কাচারির সামনে মানুষজন গোল হয়ে বসে। তারা কামালের কাছে যুদ্ধের খবরাখবর জানতে চায়। কামাল তাদের কাছে ন'মাসের বিত্তান্ত শোনায়।

ঘন্টা দুয়েক পর দাদা বলেন, 'এবার ছাড়ান দাও, নাতিটা একটু বিশ্রাম নিক।' সবাই উঠে দাঁড়ায়, একজন হঠাৎ শ্লোগান দিয়ে ওঠে 'জয় বাংলা'। সমস্বরে সবাই বলে ওঠে জয় বাংলা। কামালও গলা মেলায়। সে ধ্বনি নিস্ত ব্ধ চরাচরে ছড়িয়ে পড়ে।

রাতে খেতে খেতে দাদা বললেন, 'থেকে যা কয়েকদিন, বিশ্রাম নিয়ে যা। আবার কবে আসবি তারতো ঠিক নেই। তোরাতো শেকড় ছাড়া হয়ে আছিস।'

'না, এখন শিকড় আরো শক্ত হলো।' বলে কামাল, 'এতোদিন তো আমি কে তাতো বুঝতে পারছিলাম না, আমার পুর্বপুরুষরাও বোঝেন নি। কিন্তু, আমরাতো যুদ্ধ করে বুঝেছি এবং বুঝিয়ে দিয়েছি আমরা কে ?'

'তা ঠিক,' বললেন দাদা, 'পাকিস্তান এনেছিলাম তা রাখা যায়নি আমাদের দোষে। ইসলাম ইসলাম করে গেছি, মানুষের দিকে তাকাইনি। মানুষ না থাকলে ধর্ম থাকবে কী করে রে ভাই ?'

'কামাল, সকালেই রওয়ানা হয়ে যা, তোরে না দেইখা তোর মা'র এখন পেট পুড়তাছে।' বললেন দাদা।

সকালেও কাচারির সামনে ভিড়। নাস্তা খেয়ে কামাল রওয়ানা হলো। খবর নিয়ে জেনেছে লঞ্চ ছাড়বে দুপুরে। দাদা তাদের সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েকজন এলো বিদায় জানাতে। দাদা এবার দু'টি একশ টাকার নোট গুঁজে দেন কামালের পকেটে।

চাঁদপুর যেতে যেতে কামালের মনে হয় ন'মাস আগের কথা। পরাধীনতা আর স্বাধীনতার মধ্যে কতো তফাৎ। লঞ্চঘাটে বেশ ভিড়। অস্ত্র কাঁধেও ঘোরাফেরা করছে অনেকে। বোঝা যাচ্ছে, তারাও মুক্তিযোদ্ধা, ঢাকা যাবে। টিকেট কাটতে গিয়ে কামাল বললো, 'আমার কাছে আছে ইন্ডিয়ান ৫০ আর এখানকার ১০০। ভাংতি না থাকলে আমি টাকা দেবো কোত্থেকে ?'

কাউন্টারের ওপাশ থেকে কেরানী বললেন, 'আপনি মুক্তিযোদ্ধা, টিকেট লাগবে না।'

ভিড়ের মধ্যেও সবাই মুক্তিযোদ্ধাদের পথ করে দিচ্ছে। পরিচয় না থাকলেও তারা পরিচিত হয়ে যাচ্ছে। ডেকে কামালদের ঘিরে বসেছে লোকজন। চা-সিঙ্গারা এনে দিলো কয়েকজন। তারা মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনতে চায়। নিজেদের নয়মাসের দু:খ কষ্টের কথাও জানাতে চায়।

তিনচার ঘন্টার পথ। আধঘণ্টাও যায়নি। কিন্তু কামালের মনে হয় দীর্ঘ সময়। আব্বা-আম্মার সঙ্গে দেখা করার জন্য অস্থির লাগছে তার। এতো অস্থির গত ন'মাসেও লাগেনি। একবার দোলার কথা মনে হয়। দোলা কি বড় হয়ে গেলো নয়মাসে অনেক ? কামালকে দেখে নিশ্চয় চিনতে পারবে না, ঘাবড়ে যাবে। ঢাকায় ন'মাসে কতো হত্যা হয়েছে ?

আগরতলা ছেড়ে আসার পরই শুনেছে ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতা মতিউর রহমান নিজামী আর মুজাহিদ ডেথ স্কোয়াড বানিয়ে প্রচুর হত্যা করেছে। মেয়েদের তুলে নিয়ে গেছে। তার প্রিয় শিক্ষকদের অনেককে হত্যা করেছে। কামাল অবশ্য তাঁদের নাম জানতে পারেনি।

সন্ধ্যার ঠিক আগে লঞ্চ ভিড়লো সদরঘাট। ঘাটে বেশ ভিড়। সবদিক থেকে মানুষ ঢাকা আসছে। রিকশা পেয়ে গেলো কামাল। বললো, 'চলেন পল্টন'।

রিকশার সামনে বাংলাদেশের ছোট পতাকা। সেই পতাকা যা কামাল নামিয়ে ফেলেছিলো ভয়ে ২৬ মার্চ তা এখন আবার অনেক বাড়ির ছাদে উড়ছে। পাকিস্ত-ানিদের বদলে মুক্তিযোদ্ধাদের অনেককে অস্ত্র হাতে ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে। রাস্তাঘাটে ভিড় তেমন বাড়েনি। সন্ধ্যার ঠিক পর পরই বাড়ির গেটে এসে নামলো কামাল। রিকশাঅলাকে ৫০ টাকার নোট দিয়ে বললো, 'রেখে দেন চলবে। আমার কাছে খুচরা নেই।'

'লাগবো না স্যার।' রিকশাঅলা বললো হাসিমুখে, 'দেশ স্বাধীন করছেন, পয়সা নিমু না আপনার কাছ থেইক্যা।' কামাল তাকিয়ে থাকে, 'জয় বাংলা' বলে রিকশাঅলা প্যাডেল ঘোরায়।

বাসাটা কেমন অন্ধকার। নিচে একটা, ওপরে একটা কম পাওয়ারের বাতি জ্বলছে। সাড়াশব্দ নেই কোনো। গেট খুলে কামাল ঢুকলো। ল্যান্ডিংয়ের সামনে এসে একবার ভাবলো, দোলাকে দেখে যাই। পর মুহূর্তে মনে হলো আগে আব্বা-আম্মার সঙ্গে দেখা করে এক সঙ্গে নামবে। সিঁড়ির

কোনায় দেখলো সাইকেলটা যত্নেই রাখা আছে। খুশি হয়ে উঠলো মন, ওপরে ওঠে কড়া নাড়তে লাগলো কামাল।

যিনি দরজা খুলে দিলেন তাকে দেখে খানিকটা চমকে গেলো কামাল। চুলে পাক ধরেছে, একটু কুঁজো, চোখ দু'টি নিস্প্রভ, চোখের নিচে কালি, মুখে ক্লান্তি। দরজার সামনে অস্ত্রহাতে দাড়িগোঁফ বাবড়ি চুল অলা যুবকটিকে দেখে থমকে গেলেন রহিম সাহেব। কামাল বললো, 'আব্বা আমি কামাল,' বলে পা ছুঁয়ে সালাম করতে গেলো। রহিম সাহেব তাকে জড়িয়ে ধরলেন, বলতে লাগলেন, 'কামাল কামাল তুই ফিরেছিস আমরা যে ঘুমাই না তোর চিন্তায়... কামালের মা, আমাদের কামাল ফিরে এসেছে।' ছুটে এলেন আম্মা।

অস্ত্র নিজের ঘরে রেখে কামাল হাতমুখ ধুয়ে এসে বললো, 'চলেন হক চাচাকে সালাম করে আসি।' চেয়ারে বসে ছিলেন আব্বা-আম্মা। কামাল লক্ষ্য করলো, আব্বা হঠাৎ পাংশু হয়ে গেলেন। চেয়ার ছেড়ে নড়লেন না।

'কী হলো ?' কামাল জিজ্ঞেস করে।

'তোর হক চাচা নেই,' বলেন আম্মা।

'মানে ?'

'তাকে ধরে নিয়ে গেছে।'

আব্বা তারপর ধীরে ধীরে বললেন, ডিসেম্বরের ৬ তারিখে সন্ধ্যায় সাদা মাইক্রোবাসে করে একদল লোক আসে। অবাঙালি। পরে তিনি শুনেছেন, তাদের একজন হক সাহেবের অধীনেই কাজ করতো। সঙ্গে বাঙালি কয়জন, লোকটি এসে জানালো অফিসে জরুরি দরকার, হক সাহেবকে ডেকে পাঠিয়েছে। হক সাহেব বললেন, তিনি তো মাত্র ফিরলেন। কালকে যাবেন। তারা জেদ ধরলো, এখনিই যেতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে অস্ত্রও বের করলো। এইসব কথা বার্তা হচ্ছিলো।

বারান্দায় হক সাহেব চিৎকার করে ডাকলেন, 'দোলার মা'। তারা তখন টেনে হিঁচড়ে তাকে নিয়ে যাচ্ছে। দোলা বারান্দা থেকে তা দেখে চিৎকার করে বেরিয়ে এসে হক সাহেবকে জড়িয়ে ধরে। 'না আব্বা যাবেন না।' রহিম সাহেব দোলার চিৎকার শুনে বারান্দা থেকে এ দৃশ্য দেখে ছুটে সিড়ি ভাঙ্গতে থাকেন। ছোট দাড়িঅলা একজন বলে, 'মাইয়া যখন বাপরে যাইতে দিব না তখন তারে নিয়াই চল।' দোলাকেও তারা মাইক্রোবাসে উঠিয়ে নেয়।

'দোলা, আমি কামাল, আমি ফিরে এসেছি।'

'দোলা অবশ্য ফেরৎ এসেছে দিন পাঁচেক পর। হক সাহেব আসেন নি।' কামালের মা বলেন।

কামাল হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। চোখে পানি, ক্রোধে বুক জ্বলছে, মনে হচ্ছে সব কিছু ভেঙ্গেচুড়ে চুরমার করে দিতে। দরজা খুলে সে নিচে নামতে থাকে। কামালের আব্বা আম্মাও পিছে পিছে নামতে থাকেন। কড়া নাড়ে কামাল। চুপচাপ। আবার কড়া নাড়ে। রহিম সাহেব বলে উঠেন, 'ভাবি, আমার কামাল ফিরেছে।'

হক চাচী দরজা খুলে দেন। কামাল দেখে এ এক অন্য হক চাচী। পরনে শাদা ময়লা শাড়ি, চুলে জট, চোখের নিচে কালি, মুখটা মনে হয় ভেঙ্গেচুড়ে গেছে। কামালকে দেখে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকেন, 'কামাল তুমি আসছো, তোমার চাচাতো ফিরলো না। তোমারে দেখলে কতো খুশি হইত।'

তিনি বিলাপ করতে করতে পুরো ঘটনাটা বলেন। কামাল ভাবে, এই তা'হলে স্বাধীনতার পুরস্কার! যে যব বাঙালি এ কাজ করলো তাদের জানের বদলে জান না নিলেতো জান ঠাণ্ডা হবে না। কামাল শুধু জিজ্ঞেস করে, 'দোলা কই?'

'আর হতভাগা মেয়েটার কথা বইলো না,' কাঁদতে কাঁদতে বলেন হক চাচী, 'আমার সোনার মতো মেয়েটা কী হয়ে গেলো, খায় না দায় না কথা বলে না...'

কামাল নিজেকে ছাড়িয়ে দোলার ঘরের দিকে এগোয়, তারা তিনজন খাবার টেবিলের সামনেই দাঁড়িয়ে থাকেন। রহিম সাহেব শুধু বিড়বিড় করে বলেন, 'ভাবি শক্ত হোন, শক্ত হোন আমরাতো আছি।'

ঘরটা অন্ধকার। দেয়াল খুঁজে সুইচ টিপলো কামাল। হঠাৎ আলোয় চোখে ধাক্কা লাগলো। কামাল দেখলো, জানালা ধরে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে একটা মেয়ে। পিঠে চুলের ঢল, কিন্তু ময়লা, না আঁচড়ানো জট পাকানো।

কামাল ডাকলো, 'দোলা'।

কোনো জবাব নেই।

'দোলা, আমি কামাল, আমি ফিরে এসেছি।'

দোলা আস্তে আস্তে ফিরলো, মুখ চোখ শুকনো। মুখে কোনো ভাব নেই। চোখ দু'টি জ্বলছে। কামাল, 'আমি কামাল, দোলা, আমি ফিরে এসেছি। বলেছিলাম না দেশ স্বাধীন করে ফিরবো।'

আস্তে আস্তে পানি জমছে দোলার চোখে। কামালের দিকে দৌড়ে আসে দোলা। কামাল তাকে জড়িয়ে ধরার আগে ফুঁপিয়ে সে বলে, 'কামাল, অনেক দেরি হয়ে গেলো,' কান্নায় গলা বুজে আসছে, 'আব্বা আসবেন না, ওরা মেরে ফেলেছে,' আবার ফোঁপাতে লাগলো, 'আব্বা আর আসবেন না, আমার কী করে গেলো কামাল, আমি বাঁচবো কীভাবে ?' তার কান্নার শব্দ বাড়তে থাকে। কামাল খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। অনেক মমতায় তার চুলে হাতবোলাতে বোলাতে বলে, 'দোলা, আমি আমরা আছি। আমরা থাকলে তুমিও থাকবে। কোঁদো না শক্ত হও। আমি তো ফিরে এসেছি।' দোলার কান্না থামেনা।

কামালের আব্বা-আম্মার চোখে পানি। হক চাচী শুধু বলেন, 'মেয়েটা কাঁদছে। এতোদিন একফোটা চোখের পানিও ফেলে নি।'

'ওকে কাঁদতে দিন, কেঁদে একটু হালকা হোক,' বিষণ্ন ভাবে বললেন রহিম সাহেব।

বাইরে গলির অন্ধকারে তখন তিনচারজন খুশিতে চিৎকার করে উঠছে।

জয় বাংলা! জয় বাংলা!